শেষ ভ্রমণ

– এস.এম. আছাব আলী

বাংলাদেশ নৌ বাহিনীতে আমার চাকরি জীবনের শেষ পাচটি বছর কেটেছে *বিএনএস পাবনা* নামের একটি ছোট্ট গানবোটে। আমি ছিলাম এই গানবোটের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। খাদ্য, চোরাচালান ও জলদস্যুতা রোধে আরো তিনটি গানবোটের সঙ্গে এটাও অধিকাংশ সময় মংলা বন্দরে অবস্থান করতো।

এই গানবোটে নদীপথে দুবার গিয়েছি চট্টগ্রাম। অসংখ্যবার গিয়েছি পশুর নদীর মোহনায় ফেয়ারওয়েবয়, হিরণ পয়েন্ট, সুন্দরবনের কয়েকটি শাখা নদীতে। গিয়েছি পাইকগাছা–শ্যামনগর–কালিগঞ্জ–রামপাল–শরণখোলা। এই গানবোটে আমার চাকরি জীবনের অনেক সুখ এবং দুঃখের সময় কেটেছে। এই জাহাজটির নাম আমার স্মৃতিতে এখনো অম্লান। এগুলো ছিল আদেশপ্রাপ্ত এবং পোশাকি ভ্রমণ। এখানে রোমাণ্টিকতার কোনো স্পর্শ নেই। এই বিএনএস পাবনা জাহাজে নদীপথে আমার চাকরি জীবনের শেষ ভ্রমণটি ছিল অত্যন্ত বেদনাদায়ক।

১৯৯১ সালের ২৯ এপৃল ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে দেশের উপকূলগুলোতে জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। মে মাসের প্রথম দিকে অর্ডার এলো ত্রাণসামগ্রী নিয়ে ভোলা যাবে বিএনএস পাবনা। খুশি হয়েছিলাম। শৃঙ্খলিত ও নিয়মতান্ত্রিক জীবনে মানব সেবার এই অপূর্ব সুযোগে আসবে অনেক বৈচিত্র।

সঠিক দিন তারিখ মনে নেই। খুলনা নৌ ঘাটিতে *নৌ পরিবার কল্যাণ সমিতি*–সহ বহু সমিতি, সংগঠন, প্রশাসন ও ব্যক্তির দেয়া ত্রাণ–সামগ্রীতে জাহাজ ভর্তি হয়ে গেল।

নির্দিষ্ট দিনে খুলনা থেকে ভোলার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। প্রশাসনিক এবং পাইলট বদলের কারণে বরিশালে আমাদের কিছুটা দেরি হয়েছিল। ভোলায় যখন পৌছালাম তখন প্রায় সন্ধ্যা। বিআইডাবলিউটিএ পন্টুনে জাহাজ বাধা হলো।

পরদিন থেকে স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় রিলিফ বিতরণের কর্মসূচি শুরু হলো। চিড়ে–মুড়ি, জামা–কাপড়, লুঙ্গি, প্লাস্টিকের হ্যারিকেন, বদনা–ম্যাচ ইত্যাদি। ভোলার কয়েকটি চরঅঞ্চলসহ বিভিন্ন স্থানে আমরা রিলিফ বিতরণ করেছিলাম। আজ এতো দিন পরে সব জায়গার নামও আমার মনে নেই।

যাহোক, একদিন এক রিলিফ ক্যাম্পে শ্বেত–শুশ্রূমণ্ডিত এক বৃদ্ধের ওপর আমার চোখ পড়লো। মনে হলো তাকে চিনি। কাছে গিয়ে নিশ্চিত হয়ে তার হাত ধরে আড়ালে টেনে নিলাম।

জীবনের কোনো কোনো সত্য, বিশ্বাস করি চিরসত্য। প্রতিবেশ পৃথিবী বোধ, আত্মকেন্দ্রিক জীবন পরিক্রমা এবং আন্তরিক ও বিশ্বাসযোগ্য একজন মানুষের আকস্মিক সাক্ষাতে আমার হৃদয় খেপে উঠলো। তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললাম, কুদ্দুসভাই, কেমন আছো?

তিনি প্রথমে আমাকে চিনতে পারলেন না।

তখন আমার পরনে ছিল নৌ বাহিনীর নীল পোশাক। চোখে সানগ্লাস ও মাথার জকি ক্যাপ (ব্লু বিলেট) খুলে বললাম, আমি আছাব আলী।

এবার আমাকে চিনলেন। তার সেই চিরস্বভাব সুলভ বরিশালের আঞ্চলিক ভাষায় বললেন, কেমন আছিস ভাইডি। প্রশ্নের ওপর প্রশ্ন।

আসলে আমরা কেউই ভালো ছিলাম না। মহাপ্রলয়ে বিধ্বস্ত সেই জায়গায় অগ্রজতুল্য একজন পুরনো সহকর্মীকে দেখে আমার মনে হলো, আমি জীবনের এক অন্ধকার, অচেনা বন্দরে এসে দাড়িয়েছে। হারিয়ে গেলাম এক পরিচিত অতীতের সন্ধানে।

তখন ষাটের দশকের শুরু। তদানীন্তন পাকিস্তান নৌ বাহিনীতে ভর্তি হয়ে বাঙালি–পাঞ্জাবি–পাঠানদের মাঝে যে কয়েকজন ভালো মানুষের সান্নিধ্য পেয়েছি তাদের মধ্যে ছিলেন বরিশালের মনোয়ারভাই এবং এই কুদ্দুসভাই। এরা এতো সৎ এবং পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করতেন যে, ভাবতেও অবাক লাগতো। সেই সৎ কুদ্দুসভাইকে আজ এই রিলিফি মানুষদের মাঝে দেখে আমার চোখের পাতা ঝাপসা হয়ে এলো।

আজ অনেক দিন পর জীবনের একটি হারিয়ে যাওয়া ছোট্ট ঘটনা নিয়ে লিখতে বসে আমার অনেক কথা মনে পড়ছে। এখানে সূর্য, সমুদ্র, বাতাস আছে। এখানে নিম্নচাপের সৃষ্টি হবেই। অনন্তকাল পর্যন্ত ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস এদের আঘাত করবেই।

১৯৭০ সালের ১১ নভেম্বর দিনগত রাতে এমনি অথবা এর চেয়ে বড় এক মহা প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় হাতিয়া–সন্দ্বীপ–ভোলার ওপর আঘাত করেছিল। করাচিতে আমরা একদিন পর পত্রিকা মারফত এই ঘূর্ণিঝড়ের খবর জানতে পারি। মনে আছে, সেদিন দৈনিক ইত্তেফাকের বড় বড় হেডলাইন ছিল *কাদো, বাঙালি কাদো!* সেদিন কুদ্দুসভাইকে কাদতে দেখেছি। হাতিয়া–সন্দ্বীপ–ভোলায় অন্য সহকর্মী ভাইদের পরিবারের মঙ্গল কামনায় আমরা সকলে কেদেছি। পরবর্তী জীবনে চট্টগ্রাম, মংলা ও খুলনা শিপইয়ার্ডে অনেকবার ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস প্রত্যক্ষ করেছি এবং ধ্বংসলীলা দেখেছি।

১৯৯১ সালের মে মাসে ভোলায় অসহায় মানুষদের মাঝে রিলিফ বন্টনের সেই ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা আমাকে এখনো ব্যথিত করে। রিলিফ যারা দেন তাদের পুণ্য হয়, সুনাম হয়। পত্রিকার পাতায় ও টিভির পর্দায় তাদের ছবি আসে। কিন্তু যারা রিলিফ নেন তাদের মনের অবস্থা কেমন থাকে? সেই কথা মনে হলে ভীষণ রকম পীড়িত হই। একটা গ্লানি আমাকে কুড়ে কুড়ে খায়।

কুদ্দুসভাইকে বেশি বিব্রত বোধ করার সুযোগ না দিয়ে বললাম, বিআইডাবলিউটিএ জেটিতে আমাদের জাহাজ আছে। আগামীকাল পিএম আমাদের সেইলিং। তুমি বারোটার মধ্যে জাহাজে এসো কুদ্দসভাই, কথা আছে।

হ্যা, সেদিন যথাসময়ে কুদ্দুসভাই আমাদের জাহাজে এসেছিলেন। সে কথা একটু পরে বলছি।

কিছু কিছু মানুষ অধিকার করেন জীবন ও অভিজ্ঞতার এমন এলাকা যেখানে আর কখনো ফিরে যাওয়া সম্ভব হয় না। আমার সেই সিনিয়র সহকর্মী যিনি আমার থেকে অন্তত দশ বছর আগে অবসর নিয়েছিলেন তিনি এখনো বেচে আছেন কিনা জানি না। তেরো বছর আগের সেই ঘটনায় আর ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়।

আজ ১৪১১ সালের ১ আষাঢ়। গ্রামে একটি মাটির ঘরে বসে এই লেখাটি লিখছি। আমার হৃদয়ের পর্দা মলিন। কিন্তু আমার ঘরের জানালা প্রশস্ত। বাইরে ঝম ঝম করে বৃষ্টি পড়ছে। গাছের সবুজ পাতা শির শির করে দুলছে। আমার জানালার খুব কাছে একটি ছোট্ট কদম গাছে প্রথম ফুল ফুটেছে। প্রকৃতির আশীর্বাদে এবার কৃষকের ঘরে ভালো ফসল এসেছে। তারপরও কি মানুষের ক্ষিধে মিটবে? রিলিফ দেয়ার মতো একটি ভণ্ডামির হাত থেকে আমরা আমাদের বিধ্বস্ত জনগোষ্ঠিকে কি রক্ষা করতে পারবো? যেহেতু পৃথিবী এখন ধনী ও সন্ত্রাসী মানুষদের অধিকারে।

কুদ্দুসভাইয়ের সঙ্গে আমরা সকলে অনেকক্ষণ ধরে গল্প করলাম। তার ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক জীবনের খোজ নিলাম। আমাদের সাধ্যমতো যত্নের সঙ্গে তাকে খাওয়ালাম। এক সময় আমাদের জাহাজ ছাড়ার সময় হলো। ইঞ্জিন চালু করা হলো। কুদ্দুসভাইকে বিদায় দেয়ার জন্য তাকে নিয়ে জাহাজের বাইরে এলাম। পন্টুনে দাড়িয়ে তার হাতে একটা ধূসর বর্ণের খাম ধরিয়ে দিয়ে অত্যন্ত বিনীতভাবে বললাম, তোমার পরিবারের জন্য, তোমার ছোট ভাইদের পক্ষ থেকে একটি ক্ষুদ্র সহযোগিতা, একটি ক্ষুদ্র সহানুভূতি... ।

তার বয়স ক্লান্ত মুখের ওপর গভীর পরাজয়ের ছায়া নেমে এলো। সকরুণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। বললেন, তোরা ভালো থাকিস ভাইডি।

জাহাজের সকল রশি খুলে দেয়া হলো। জাহাজ ধীরে ধীরে চলতে লাগলো। আমরা সবার হাত নেড়ে তাকে শেষ বিদায় জানালাম। ভাবতে লাগলাম এই আমরা যারা আছি, একদিন সকলের একই পরিণতি হবে। আর ছয় মাস পর আমি অবসরে যাবো। আমার জায়গায় আরেকজন আসবেন।

বাম দিকে টার্ন করে জাহাজ কীর্তনখোলা নদীতে প্রবেশ করলো। সামনে বরিশাল। নদীর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক চিরকালের। কখনো আশীর্বাদ আবার কখনো অভিশাপ হয়ে তারা মিশে আছে আমাদের জীবনে। জেলেরা নদীতে জাল ফেলেছে। চলছে ছোট-বড় নৌকা, লঞ্চ, কার্গো। কুদ্দুসভাইয়ের কথা মনে হতে লাগলো। আমাদের সামনে বরিশাল, নলছিঠি, ঝালকাঠি, কাটাখাল, কাউখোল, মংলা। তারপর চালনা বটিয়াঘাটা, রূপসা খুলনা। তারপর? আশ্চর্য! মানুষের জীবন পথ কতো ক্ষুদ্র!

বড়গাছা, জয়পুরহাট থেকে

পদ্মা নদীর মাঝি

– আলভী-ইবনে-শিহাব

কমপিউটারের মাউসের রাইট বাটনটা পর পর দুবার ক্লিক করলো কাদুমাঝি। স্ক্রনে ভেসে উঠলো জালের অভ্যন্তরীণ অবস্থার চিত্র। ঠিক তিন দশমিক দুই তিন মিটার গভীরতায় নৌকার ডান পাশের প্রান্ত থেকে সাত দশমিক আঠারো মিটার দূরে দুই দশমিক দুই তিন কেজি ওজনের একটি রুই মাছ জালে আটকা পড়েছে। গলুইয়ে বসে থাকা রোবটটাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে নৌকার হলোগ্রাফিক স্ক্রনের কাছে ফেরত গেল সে।

প্রায় তিনশ বছর আগের একটি মুভি দেখছিল, খুবই ইন্টারেস্টিং। নাম *পদ্মা নদীর মাঝি*। জেলেদের জীবন চিত্র আগে কি রকম ছিল এ সিনেমাটি না দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না। এ সিনেমাটি সে কমপক্ষে দশ বারো দেখেছে, তারপরও দেখতে ইচ্ছা করে।

কমিউনিকেটরের *কো কো* শব্দে তার চিন্তায় ছেদ পড়লো। ধরতে ইচ্ছা করছে না।

রোবটটা এগিয়ে এসে কমিউনিকেটরটা হাতে নিল।

খানিকটা দূরে গিয়ে রেড বাটনটা চেপে খুব নিচু গলায় কথা বলছে। চোখ স্ক্রনে থাকলেও কান দুটো খাড়া করে রাখলো কাদুমাঝি।

রোবটটি ভোতা গলায় কার সঙ্গে যেন কথা বলছে। স্যারকে এখন বিরক্ত করা যাবে না। সেই অদ্ভুত মুভিটা দেখছেন। আমি কথা বলতে গিয়ে তিনবার ধমক খেয়েছি। শেষবার বলেছে, আবার যদি ডিসটার্ব করি তাহলে আমার মাথার কপোট্রনটা খুলে পানিতে চুবাবে।

রোবটটির কান দিয়ে যখন *হিস হিস* শব্দে লাল রঙয়ের হালকা ধোয়া বের হলো তখন হস্তক্ষেপ করলো কাদুমাঝি। নিশ্চয় কমিউনিকেটরের ওপ্রান্তে যে আছে সে তাকে খুবই অপমানজনক কোনো কথা বলছে। প্রচণ্ড অপমানিত হলে এ রোবটটির কান দিয়ে লাল ধোয়া বের হয়। এটি একটি গাধা ধরনের রোবট। বুদ্ধি পরিমাপক স্কেলে তার মাত্রা মাত্র পঞ্চাশ। তবে শক্তি প্রচুর।

আজকাল নাকি পাচশ মাত্রারও বেশি বুদ্ধি দিয়ে রোবট তৈরি হচ্ছে। আরেকটি কম্পানি সম্প্রতি ঘোষণা দিয়েছে, আগামী দুই বছরের মধ্যে তারা মানুষের মতো ভাবাবেগ সম্পন্ন রোবট বাজারে ছাড়বে। রোবট হাসবে, কাদবে, দুঃখ পাবে, কষ্ট পাবে। কাদুমাঝির খুব ভাবতে ইচ্ছা করছে রোবটরা বিয়েও করবে, ঘর-সংসার করবে, ছেলেপুলে হবে। সেদিন বোধহয় খুব বেশি দূরেও নয়।

যাহোক, রোবটটির হাত থেকে প্রায় কেড়ে নিয়ে কমিউনিকেটরের ছোট্ট স্ক্রনের দিকে তাকালো। তার সতেরো বছর বয়সী ছোট ছেলে রবিন। কলেজ ছুটি হয়েছে, পরনে ইউনিফর্ম, বাম বগলে পিপিসি (পোর্টেবল

পারসনাল কমপিউটার) আর ডান বগলে ইলেকট্রনিক বইয়ের ব্যাগ। কলেজে যদিও তার একটি পিসি রয়েছে তবুও তার পিপিসিটা সে সঙ্গে রাখবেই। নিজে কি একটা প্রোগ্রাম যেন ডেভেলপ করছে।

স্কুল থেকে প্রতিদিন যে ইলেকট্রনিক কার্ডটি গার্ডিয়ানদের পাঠানো হয় সেটি কয়েকদিন যাবৎ নিজ চোখে পরখ করা হচ্ছে না। যা দেখা বা করার তা রোবটটিই করছে। শুধু বলা ছিল অস্বাভাবিক কিছু হলে যেন তাকে জানানো হয়।

দরদ ভরা গলায় জিজ্ঞাসা করলো, কি হয়েছে বাবা রবিন। কথার খৈ ফুটলো রবিনের মুখে। ওই স্টুপিডটাকে তুমি কমিউনিকেটর ধরতে দিয়েছো কেন? তুমি জানো না, যাদের বুদ্ধি দুইশ মাত্রার কম, আমি তাদের সঙ্গে সাধারণত কথা বলি না।

খুব ঠাণ্ডা গলায় উত্তর দিল কাদুমাঝি। বড়দের সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে তা কি তোমার স্কুলে শিক্ষা দেয়া হয় না?

তৎক্ষণাৎ থেমে গেল রবিন। তার বুদ্ধি দুইশ দশ মাত্রার অর্থাৎ বাবার চেয়ে মাত্র নব্বই কম। পরিস্থিতি সামলে নিল। গলা সপ্তম মাত্রা থেকে নামিয়ে প্রথম মাত্রায় সেট করলো। অনুরোধের সুরে বললো, তোমাকে কয়েকদিন ধরে বলছি, আমাকে একটা বুদ্ধিমান রোবট কিনে দিতে হবে। কিন্তু তুমি দিচ্ছো না। আমার পিপিসি এবং ব্যাগ বহন ছাড়াও অনেক কাজ আছে। এক বছর আগে সরকারি সার্কুলার প্রত্যাহার করে নেয়া হয়েছে যে, এখন থেকে জটিল রাশিমালার সমীকরণে সর্বোচ্চ দুইশ মাত্রার রোবটের সাহায্য নেয়া যাবে। আজকাল অনেক ছাত্ররাই রোবট নিয়ে ক্লাসে আসছে। যারা গরিব তারাও কেউ কেউ কিনছে। অথচ তুমি দিচ্ছি, দেবো বলে দিচ্ছ না। কাল আমাকে অবশ্যই একটা রোবট কিনে দিতে হবে।

মুভির দিকে তাকিয়ে থাকলেও কথাগুলো শুনলো কাদুমাঝি। কমপিউটারের *বিপ বিপ* আওয়াজ শুনে বুঝতে পারলো আরেকটি মাছ আটকেছে তার জালে। মনে মনে বললো, এটি যদি ইলিশ মাছ হয় তাহলে অবশ্যই ছেলেকে একটি রোবট কিনে দেবে। আজকাল ইলিশ মাছ খুব একটা দেখা যায় না। বলা যায়, বিলুপ্ত হতে চলেছে।

ইলেকট্রনিক পত্রিকায় রিপোর্ট পড়েছে আগামী এক বছরের মধ্যে সিনথেটিক সুস্বাদু ইলিশ মাছ বাজারে পাওয়া যাবে। এই মাছের ব্যাপক চাহিদার ফলে বিদেশি একটি কম্পানি এখানে প্রজেক্ট করছে। পত্রিকার ভাষ্য অনুযায়ী কাটতে হবে না, ধুতে হবে না, প্যাকেট খুলেই খাওয়া যাবে।

শরীরটা কেমন জানি গুলিয়ে উঠলো। ছেলেকে লাইনে রেখে মাউসটা ডাবল ক্লিক করে কাদুমাঝির চোখ ছানাবড়া। সত্যিই একটা ইলিশ মাছ। এক দশমিক নাইন জিরো জিরো নাইন কেজি ওজন। মুখের হাসি কান পর্যন্ত বিস্তৃত হলো। মোলায়েম কণ্ঠে ছেলেকে বললো আজই দুই ঘন্টা পর তোমাকে একটা রোবট কিনে দিচ্ছি।

রিস্টওয়াচের সবুজ বাটনটা চাপ দিয়ে জানা গেল বাড়ি থেকে ছয়শ পঞ্চাশ কিলোমিটার নৌপথ দূরত্বে অবস্থান করছে কাদুমাঝি। নৌকার কন্ট্রোল প্যানেলে ঘণ্টায় তিনশ পঞ্চাশ কিলোমিটার গতিবেগ সেট করে হলোগ্রাফিক স্ক্রনের কাছে ফিরে এলো। অদ্ভুত মুভিটা আবার দেখতে হবে।

চাষাড়া, নারায়ণগঞ্জ থেকে

আষাঢ়ের গল্প

– সৈয়দ সালমান

যে কোনো একদিনের ঘটনা। সালটা সঠিক মনে নেই। পুরোপুরি সঠিক না হলেও সালটা সম্ভব ১৯৭৫ অথবা ১৯৭৬ হবে। পুলিশ ডিপার্টমেন্টে চাকরিরত। স্থান মাদারীপুর। তখন পোস্টিং ছিল মাদারীপুর।

একদিন বিকেলে খবর পেলাম শিবচরে জমি সংক্রান্ত মারামারিতে একজন খুন হয়েছে। তৎক্ষণাৎ চারজন সিপাহিসহ নৌকাযোগে শিবচরের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম।

তখন আবার নৌকাযোগে যেতে হতো। নৌকা চালাতো মাঝি। বর্তমান যুগের মতো কোনো ইঞ্জিন ছিল না। অতএব শিবচর পৌছাতে প্রায় রাত দশটা বেজে গেল।

লাশের সুরতহাল রিপোর্ট তৈরি করে মাদারীপুর নিয়ে আসার ব্যবস্থা করলাম।

লাশটা হোগলা পাটি দিয়ে প্যাচিয়ে নৌকায় তোলা হলো।

তখন রাত প্রায় একটা। নৌকায় এক পাশে কাত হয়ে ঘুমিয়ে রয়েছি।

পাশেই চারজন পুলিশ। এরা সবাই ঘুমে আচ্ছন্ন।

মাঝি দুজন নৌকা বেয়ে চলেছে। এরই মধ্যে হঠাৎ একজন মাঝি বলে উঠলো, স্যার স্যার, লাশটা বসে রয়েছে।

তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখে তাকিয়ে দেখলাম পাটিতে মোড়ানো অবস্থায় লাশটা বসে রয়েছে। দেখে আমার গায়ের রক্ত হিম হয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ ফাকা দুই রাউন্ড গুলি করতেই দেখা গেল লাশটা আবার আগের মতো শুয়ে রয়েছে।

আমরা সবাই আলোচনা করলাম, মনে হয় আমরা ভুল দেখেছি।

আবার ঘুমানোর চেষ্টা করলাম। আবার দেখি সেই একই অবস্থা। তখন আবার গুলি করে দেখি আবারও শুয়ে রইলো।

লাশটা আমাদের সঙ্গে একটা ভেলকিবাজি শুরু করলো।

আমরা একটা ঘাটে নৌকা ভিড়িয়ে লাশ এবং নৌকা রেখে চলে গেলাম। তারপর নৌকা পাহারায় মাঝি ও দুইজন পুলিশকে রাখলাম।

শেষে যখন ওই লাশের ভেলকিবাজির অত্যাচারে অতিষ্ঠ তখন আর টিকতে না পেরে লাশ এবং নৌকা রেখেই চলে এলাম।

পরের দিন গিয়ে দেখি লাশ নৌকায় নেই। এ দেখে আমাদের তো অবস্থা কাহিল। তাই সবাই নামলাম লাশ খুজতে। শেষে আমাদের গন্তব্য থেকে তিন মাইল দূরে লাশ পেলাম। লাশ উঠিয়ে আবার নৌকায় করে মাদারীপুর নিয়ে এলাম।

ভূত-প্রেত বিশ্বাস কখনো করতাম না। তবে ওটা কি ছিল?

উত্তর টেপাখোলা, পুরান বাজার
ফরিদপুর থেকে

ইয়াগু

- F.R

১৯৯৭ সালে সমুদ্রে একটা চাকরি জুটলো। হংকং ভিত্তিক এক বৃটিশ জাহাজ সংস্থা। চাকরিটা জুটেছিল চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটিতে থাকার সময়। সদ্য অনার্স ফাইনাল দিয়েছিলাম। তবে আগের আবেদন করা চাকরিটা যে পেয়ে যাবো তা আমার স্বপ্নেও ছিল না। অবশ্য আমাকে এর জন্য হংকংয়ে কঠিন পরীক্ষায় পাস করতে হয়েছিল।

চাকরি জুটলেও পরিবার থেকে বাধা এলো। ঘরের একমাত্র ছেলেকে কেউ অজানা পথের চাকরিতে দিতে চায়নি। শুধু আমার একক ইচ্ছায় চাকরিতে জয়েন করা হলো।

আমার পোস্টিং হলো দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে। ভাগ্যে পড়লো একটা কনটেইনারবাহী জাহাজ। শুরুতে খুব ভয় পেতাম উত্তাল সাগরের ঢেউকে, হঠাৎ শুরু হওয়া ঝড়ো হাওয়াকে। এগুলো আমার অন্তর আত্মাকে

কাপিয়ে দিতো। তবে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতাম তিমি মাছ দেখে। এতো বড় মাছ যে পৃথিবীতে থাকতে পারে তা কল্পনাও করিনি! তবে বইয়ের পাতায় পড়েছিলাম একটা বয়স্ক হাতিও নাকি তিমি মাছের কাছে বাচ্চা। তাই বলে এতো বড়!

আমার বিস্ময় আর ভয়কে অভয়ে পরিণত করতেন আমার সিনিয়র কলিগ কাম রুমমেট ইয়াগুচি। জাপানের কোবে শহরের বাসিন্দা ইয়াগুচি খুব কৌতুকপ্রিয় মানুষ ছিলেন। সব সময় হাসি–খুশি থাকতেন যেন জীবনে কোনো দুঃখ নেই। ইয়াগুচি বিবাহিত ছিলেন এবং তার স্ত্রী বছরে দুইবার আসতেন আমাদের জাহাজে। প্রতিবার দুই তিন মাস কাটাতেন ইয়াগুচির সঙ্গে।

ইয়াগুচি ছাড়াও জাহাজের অন্য সব ক্রুদের সঙ্গে আমার ভালো সম্পর্ক ছিল। তবে আমাদের জাহাজে নরওয়েজিয়ানদের বেশ দাপট ছিল। ক্যাপটেন থেকে শুরু করে সাধারণ ক্রু সবাই ছিলেন নরওয়ের শুধু ছয়জন ছাড়া। তিনজন ইসরেলি ও একজন আমেরিকান।

যেহেতু ইয়াগুচি আমার রুমমেট ছিলেন, তাই তার সঙ্গে আমার গাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। আমরা পরস্পরকে অনেক কিছুই শেয়ার করতাম। আমাদের সুখ–দুঃখগুলোও শেয়ার করে উপভোগ করতাম। তবে ইয়াগুচির সব ভালো স্বভাবের মাঝে তিনটা খারাপ স্বভাব ছিল। *এক.* খুব শ্যামপেইন খেতেন। *দুই.* নীল ছবি বেশি দেখতেন। *তিন.* মেজাজ বিগড়ে গেলে নিজেকে কন্ট্রোলে রাখতে পারতেন না।

জাহাজ জীবনে সবচেয়ে মজার সময় কাটতো যখন ইয়াগুর স্ত্রী ইমি আসতেন। হই চই করে সময় পার হয়ে যেতো। ডিউটির সময়ও বেশ আড্ডা দেয়া যেতো।

এর জন্য মাঝে মধ্যে বুড়ো ক্যাপটেন ধমকও লাগাতেন। এক ডিউটিতে কার্ড খেলে, দাবা নিয়ে বাজি ধরে আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করে চলে যেতো সময়। শুধু আমার একটা সমস্যা হতো, রুমটা ছেড়ে দিতে হতো।

ইমি চলে গেলে আমাদের দুজনেরই সাময়িক বিষণ্নতা পেয়ে বসতো। তখন দুজনেই প্রচুর হাভানা চুরুট খেতাম।

১৯৯৯ সালের এপৃলে ইমি একবার এসেছিলেন। আবারও মজার সময় কাটালাম। একুশ দিন ছিলেন। জানুয়ারি মাসে আসবেন বলে চলে গেলেন।

২০০০ সালের জানুয়ারিতে ইমি এলেন না। তবে টেলিফোনে কথা হতো। তিনি বলতেন, শারীরিক অবস্থা ভালো না। ইয়াগুচি যেন অবশ্যই ফেব্রুয়ারিতে দেশে যায়।

ইয়াগুচি আর আমি দুজেনই দুই মাসের ছুটির অ্যাপলিকেশন করলাম। ক্যাপটেন আশ্বাস দিলেন ছুটি হবে।

ফেব্রুয়ারিতে পাপুয়া নিউ গিনি থেকে আমাদের জাহাজ চিলির সানটিয়াগো যাচ্ছিল। ক্যাপটেন আশ্বাস দিলেন সানটিয়াগোতে ছুটি মঞ্জুর করার।

সেদিন ছিল ৯ তারিখ। দুজনের অফ ডিউটি থাকায় জাহাজের ছাদে বসে দূরবীনে প্রশান্ত মহাসাগরকে উপভোগ করছিলাম। হাতে ছিল হাভানা চুরুট ও কার্লসবার্গ বিয়ারের ক্যান।

একজন নাবিক একটা চিরকুট নিয়ে এসে আমাদের প্রাইভেসিতে ভাঙলো। ইয়াগুচির দিকে চিরকুটটা হাসি মুখে বাড়িয়ে দিল। কাধে চাপড়ে বললো, Good day man, enjoy it. - গুড ডে ম্যান, এনজয় ইট।

চিরকুটটা ইয়াগুচি পড়ে আমার ওপর ঝাপিয়ে পড়লেন আর গে (Gay বা সমকামী)–দের মতো চুমু দিতে লাগলেন।

কোনো মতে তাকে ছাড়িয়ে চিরকুটটার বিষয়বস্তু জানতে চাইলাম।

তিনি আমার হাতে চিরকুটটা বাড়িয়ে দিয়ে *ইয়াহু* বলে আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন।

চিরকুটটায় লেখা ছিল, Emi has given birth to a daughter, Come soon. – ইমি একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছে। তাড়াতাড়ি এসো।

দুজনেই এক সঙ্গে ইমিকে ফোন করলাম। অনেক হাসি–তামাশা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন হলো। তবে ইমি আমাদের দুজনকে দায়িত্ব দিল তার সুন্দর একটা নাম রাখার।

নাইট ডিউটিতেই আমরা নাম ঠিক করলাম ওশান (Ocean বা সমুদ্র)। অবশ্য নামটা প্রথমে আমিই ঠিক করেছিলাম দুটি যুক্তিতে। *এক.* তাদের যে চরম ভালোবাসার ফসল, সেই চরম ভালোবাসাটা হয়েছিল এই জাহাজে। তখন ওটা ছিল এ প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝে চলমান। এবং *দুই.* ইয়াগুর জীবনের সবচেয়ে আনন্দের সংবাদটাও এলো এই প্রশান্ত মহাসাগরেই চলমান অবস্থায়।

তবে প্রশান্ত মহাসাগর দেবী বোধহয় খুব জোরে হেসেছিলেন আমাদের দিকে তাকিয়ে। না হলে পরের দিনই এমনটা ঘটে গেল কেন?

পরদিন ইয়াগু ক্যাপটেনের কাছে ছুটির আবেদন জানালেন আবারও। তখন জাহাজ সানটিয়াগোর জলসীমায় প্রবেশ করেছিল।

ক্যাপটেন হেড অফিসে কনটাক্ট করলেন আমাদের ছুটির ব্যাপারে।

হেড অফিস থেকে জানানো হলো, যেহেতু সানটিয়াগোতে পাচ দিন থাকতে হবে, তাই এখন ছুটি না দিয়ে পরবর্তী বন্দর নিকারাগুয়ার লিওনে গিয়ে ছুটি মঞ্জুর হবে।

উল্টা মাথার ইয়াগু এই যুক্তি মানলো না। তার ছুটি চাই সানটিয়াগো থেকেই।

ক্যাপটেন তার সীমাবদ্ধতার কথা জানিয়ে তাকে শান্ত হতে বললেন।

কিন্তু ইয়াগু ছাড়লো না। প্রয়োজনে চাকরি ইস্তফা দিয়ে হলেও তার যেতে হবে। সন্তান বলে কথা!

ক্যাপটেন আবার যোগাযোগ করলেন। কিন্তু একই উত্তর, ইস্তফাও লিওনে কার্যকর হবে।

ক্যাপটেনের সঙ্গে ইয়াগুর তর্কযুদ্ধ এক সময় ঝগড়ায় পরিণত হলো। শেষ পর্যন্ত মারামারিতে।

ক্যাপটেনকে এমন ঘুসি ইয়াগু চালালেন যে বৃদ্ধ ক্যাপটেন আধঘণ্টার মধ্যে মারা গেলেন।

পরে পোর্স্ট মর্টেম রিপোর্টে জেনেছিলাম ওনার অণ্ডকোষ ফেটে গিয়েছিল।

বন্দী হলো ইয়াগু আমার রুমে। নৌ পুলিশ, কোস্টগার্ড, বন্দর কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় এজেন্ট, জাপান দূতাবাস সবই এলো।

ইয়াগুকে ছাড়াতে গিয়েছিল অন্য নাবিকেরা।

আমি ছিলাম জাহাজের ইঞ্জিনরুমে। সুতরাং সব কিছুই আমাকে শোনা কথার ওপর ভিত্তি করে লিখতে হলো। তবে ইয়াগুকে যখন বন্দী করে রাখা হলো তখন তার সঙ্গে দেখা করেছিলাম। জিজ্ঞাসা করেছিলাম অনেক কিছু। কিন্তু তিনি কিছুই বললেন না। আমার সঙ্গে জীবন্ত ইয়াগুর এটাই ছিল শেষ সাক্ষাৎ।

এরপর আধঘণ্টাও যায়নি বোধ হয়, ইয়াগুকে পাহারারত রক্ষীর চিৎকারে গিয়ে দেখি রক্তাক্ত মেঝেতে ইয়াগু পড়ে আছে। সারা শরীর রক্তে ভিজে গেছে। অনবরত ঝাকুনি দিতে লাগলেন। এক সময় নিথর হয়ে গেলেন। গলার ডান পাশের রগটা ব্লেড দিয়ে কেটে ফেলেছিলেন।

তেরো দিন পর সেই সানটিয়াগো থেকে দুই গ্রুপ দুটি কফিন বহন করে দুই দিকে চলে গেলাম। ইয়াগুকে নিয়ে আমি রওনা হলাম কোবে যেন আমার ভাইয়ের লাশ নিয়ে যাচ্ছি। চোখ ফেটে গেল। সহকর্মীরা সান্ত্বনা দিল। কিন্তু সেই দুঃখ আজো মুছে ফেলতে পারিনি।

পূর্ণ নাম ঠিকানা বিহীন, টোকিও থেকে

ফার্স্টক্লাস ও সেকেন্ড ক্লাস

– মোহাম্মদ হারুন–অর–রশিদ

মুজিব বাইয়া যাওরে...
নির্যাতিত দেশের মাঝে জনগণের নাওরে,
মুজিব বাইয়া যাওরে।

একটি ফুলকে বাচাবো বলে মোরা যুদ্ধ করি।

এই পদ্মা, এই মেঘনা, এই যমুনা নদী...।

গাজী রকেট–এর ফার্স্ট ক্লাসে এই গানগুলো গাইছিল আওয়ামী লীগের নেতা তোফায়েল আহমেদের মেয়ে এবং তার ফ্রেন্ডরা সমস্বরে। বরিশাল ছেড়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে চলছে গাজী রকেট। স্টিমারের ফার্স্ট ক্লাসে বেশ উৎসব উৎসব ভাব। আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা, তোফায়েল আহমেদ, আমির হোসেন আমুসহ আরো বেশ কয়েকজন নেতারা খুলনা থেকেই স্টিমারে। স্টিমারের পুরো ফার্স্ট ক্লাস লীগের নেতাদের রিজার্ভেশন নেয়া।

সেই আশির দশকের কথা।

আমি মোড়েলগঞ্জ থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে এই গাজী রকেটে সেই সময় সহযাত্রী হয়ে যাচ্ছিলাম আরো অনেক যাত্রীর মতো। তোফায়েল কন্যা অবশ্য স্টিমারে উঠেছিলেন বরিশাল থেকে তার বেশ কিছু ফ্রেন্ড সহযোগে।

রাত বাড়ছে ধীরে ধীরে।

গাজী চলছে কয়েকশ মানুষ ও বিভিন্ন রকম মালপত্র নিয়ে। স্টিমারের নিচ তলায় পেছনের দিকে ছাগল–ভেড়া, হাস–মুরগিও আমাদের সহযাত্রী হয়ে যাচ্ছে। বিশাল আকৃতির *গাজী স্টিমার* তার দুই পাশের চাকা দুটি অনবরত ঘুরিয়ে এগিয়ে চলছে। ঘূর্ণীয়মান চাকা দুটি বিরামহীন পানি কেটে ক্লান্তিহীনভাবে গাজীকে সচল রেখে আমাদের সেবা করে যাচ্ছে যুগ যুগ ধরে। চাকা দুটির পানি কাটার শব্দগুলোতেও একটা আলাদা তাল ও ছন্দ আছে।

দূরে নদীর বক্ষে মাঝে মধ্যে আলো দেখা যায়। জেলেরা মাছ ধরছে। যাত্রী নিয়ে দুই চারটা লঞ্চ তাদের গন্তব্যে যাচ্ছে। আকাশে ক্ষয়ে যাওয়া চাদের অর্ধেকটা আমাদের সঙ্গে চলছে। চলন্ত স্টিমারে নদীর হাওয়ায় ঠাণ্ডা লাগছে। যদিও এখন গরমকাল। দুই পাশের গ্রামগুলো পেছনে ফেলে গাজী তার সাইরেন বাজিয়ে আগমনী বার্তা ও অস্তিত্ব জানিয়ে দিচ্ছে।

এতো বড় দৈত্যটা হঠাৎ চরে বেধে গেল।

নদীর মাঝে জেগে ওঠা চর।

স্টিমার সামনে এগোচ্ছে না, পেছনেও যাচ্ছে না। অনেক চেষ্টা চললো মাস্টার, সারেং, সুকানি স্টিমারের লোকজনের। অগত্যা জোয়ার পর্যন্ত অপেক্ষা। এক সময় জোয়ার এলো। কিন্তু স্টিমার সামনে আগাচ্ছে না, পেছনে আসা যায় শুধু। ইতিমধ্যে স্টিমারের জ্বালানি শেষের দিকে। সিদ্ধান্ত হলো স্টিমার বরিশালে ব্যাক করার জ্বালানি ও খাবার নিতে হবে এবং মেঘনা হয়ে ঢাকায় যাবার।

স্টিমার পুনরায় বরিশাল এলো। কিছু মানুষের জন্য খাবার এবং স্টিমারের জন্য প্রয়োজনীয় জ্বালানি নেয়া হলো। প্রথম, দ্বিতীয় এবং ইন্টারের যাত্রী বাদে তৃতীয় শ্রেণী ও ডেকের যাত্রীদের মাঝে ইতিমধ্যে হাহাকার শুরু হলো। ডেকের যাত্রীদের মধ্যে অনেকেই দিনমজুর, খেটে খাওয়া মানুষ। তারা কেউ মংলা, মোড়েলগঞ্জ,

হুলারহাট, বরিশাল থেকে উঠেছে। হিসাব ছিল ঢাকা নেমেই কেউ রিকশা চালাবে, কেউ কুলি–মজুরের কাজ করবে। সেই পরিমাণ টাকা, সেই পরিমাণ খাবার তারা সঙ্গে নিয়েছিল। বাড়তি কোনো খাবার, কোনো টাকা তাদের ছিল না।

ওই স্টিমারে পরিচয় হয়েছিল এক ভদ্রলোকে সঙ্গে। তার বয়স ছাপান্ন সাতান্ন হবে। সহজ–সরল শাদাসিধে একজন মানুষ। লুঙ্গি এবং ফতুয়া পরা অবস্থায়ই তাকে দেখেছি। তার জন্য নির্দিষ্ট সেকেন্ড ক্লাস একটি ক্যাবিন। সেকেন্ড ক্লাসের সেলুনেই তার যাতায়াত সীমিত ছিল। ভদ্রলোককে দেখাশোনার জন্য দুজন লোক সর্বদা নিয়োজিত ছিল যারা তার ফাইফরমায়েশ খাটছিল।

তিনি যখন জানতে পারলেন রকেট বিলম্বিত হচ্ছে এবং আবার বরিশাল ফিরে এসেছে তখন তার লোক দুজনকে ডেকে বললেন, স্টিমারের মাস্টারকে বলে কিছু সময় নিয়ে বরিশাল শহর থেকে কয়েক বস্তা চিড়া, মুড়ি, কলা, গুড় যা পাওয়া যায় নিয়ে এসো।

মেঘনার বিশাল জলরাশিতে গাজী পুনরায় ঢাকা লক্ষ্যে এগিয়ে চলছে। বিলম্বিত এই জার্নিতে অথবা নৌপথ ভ্রমণে ফার্স্ট ক্লাসের যাত্রীরা দরজা লক করে ফিশ কাটলেট, স্যান্ডউইচ, সরু চালের ভাতের সঙ্গে মুরগির মাংস খেয়ে ইজিচেয়ারে দেহ হেলিয়ে মেঘনার জলরাশি মেঘনার অপূর্ব সৌন্দর্য উপভোগ করছিল।

আর কোনো এক নাম না জানা লোক খেটে খাওয়া মানুষদের কথা ভেবে চিড়া, মুড়ি, গুড়, কলা কিনে রাখছিলেন।

খেটে খাওয়া ক্ষুধার্ত সেই মানুষগুলোর পেট তিনি ভরাতে পারেননি। কিছুটা হলেও তখন ওই সব মানুষগুলোর ক্ষিধে মিটেছিল সেই মানুষটির বরিশাল থেকে কেনা চিড়া, মুড়ি, গুড়, কলায়।

খুলনা থেকে

নিজেই যখন হিরো

– শের–ই–ফারগানা মিল্টন

আমি তখন এইচএসসির ফার্স্ট ইয়ারে। কলেজ হস্টেল থেকে পড়ছি। উঠতি বয়স, খোলামেলা, বাধনহীন, উন্মুক্ত পরিবেশের সঙ্গে সৃজনের দেয়া হিরো মার্কা ফিগারের কারণেই বোধ হয়, ফিল্মি স্টাইলে সব কিছু সমাধান করার এক খেয়ালি প্রবণতা আমাকে পেয়ে বসে।

কোরবানির ঈদ আসন্ন। বাড়ি তো যেতেই হবে। বর্ষা মরসুমে গ্রামে যেতে নওগার তালতলা ঘাট থেকে চল্লিশ মিনিটের নৌপথ।

ঈদের তিন দিন আগে বেলা চারটার দিকে ফ্যাশনেবল ড্রেস পরে তালতলা ঘাটে পৌছার কিছু মাত্র পর বান্দাইখাড়ার এক ছাউনি বিহীন শ্যালো নৌকায় যাত্রা শুরু হলো। নৌকাটি ছিল মাঝারি আকৃতির, যাত্রী ছিল জনাবিশেক। নৌকায় আমার অপর প্রান্তে এক দেড় বছরের কন্যা সন্তানসহ সস্ত্রীক এক ভদ্রলোক বসা ছিলেন।

নৌকা চলছে। দীঘলী নামের বিশাল এক বিল। চারদিক কেবল পানি আর পানি। মেঘলা আকাশ ও দখিনা মৃদু হাওয়ায় শ্যালো নৌকার ঢুক ঢুক শব্দে রঙিন সানগ্লাসের মধ্য দিয়ে দেখা সেদিনের সেই মনোরম মুহূর্তের একখান ছবি যদি আকতে পারতাম তাহলে হয়তো বোঝানো যেতো সেদিনের সে প্রাকৃতিক আয়োজনটা কতোটাই ভালো লাগার মতো ছিল।

চোখ বুজে গুন গুন করছিলাম। এরই মধ্যে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়তে লাগলো। কোনো কিছুকে তোয়াক্কা না করে সশব্দে গাইতে থাকি। হঠাৎ ঝপাৎ শব্দে সংবিৎ ফিরে এলে দেখি নৌকার অপর প্রান্তের চাটাইয়ে বসা সেই স্বামী–স্ত্রীর হাউ মাউ কান্না। তাদের কোলে সেই শিশু কন্যাটি নেই।

বুঝতে এটুকু সময় লাগেনি আমার। মুহূর্তেই ফিল্মি কায়দায় ঝাপিয়ে পড়ি দীঘলীর পানিতে। পাশেই কলমিলতার অকৃত্রিম প্রাচীর। আন্দাজ মতো সেই প্রাচীর ঘেষে ডুব দিয়ে খুজতেই হাতে ধাক্কা লাগে। অমনি দুই হাতে জাপটে ধরি বাচ্চাটিকে এবং করুণাময়ের অপার কৃপায় বাচ্চাসহ ভেসে উঠি।

এদিকে মাঝিও নৌকা চালানো বন্ধ করে দিয়েছে।

সেদিন জলে ডোবা শিশুটিকে পাগল প্রায় বাবা মায়ের হাতে তুলে দিয়ে খুব স্বাভাবিকভাবেই বাড়ি যাই। কারণ আমি তখনো হিরো। একজন হিরোর কাছে এ আর নতুন কি!

আজ বহুদিন বাদে সেদিনের সেই ছোট্ট মেয়েটি এসএসসিতে জিপিএ–ফোর পেয়ে যখন মিষ্টির প্যাকেট হাতে প্রথম আমার বাসায় এসে নিজ হাতে আমার মুখে মিষ্টি তুলে দিল তখন আমার সকল স্বাভাবিকতা নিমেষেই কোথায় যেন পালিয়ে গেল। এক অহেতুক যন্ত্রণা আমাকে গ্রাস করতে থাকে এই ভেবে যে, সেদিন মানবতার কারণে আমি সেই শিশুটিকে জল থেকে ওঠাতে যাইনি এবং নৌকায় উপবিষ্ট বহুজনও তা করেননি। সেদিন একজন হিরো হিসেবে হিরোর কাজটাই করি।

আজ কেবলই মনে হচ্ছে, এতোটা পড়াশোনা করে, বিভিন্ন অভিজ্ঞতায় অর্জিত যে সাফল্যময় জীবন ধারা, কেন জানি সেদিনের সেই খেয়ালি যুবক হিরোর কাছে তার এতোটুকু দাম নেই।

হাসপাতাল, রোড, নওগা থেকে

বাংলার অপহার

– গোলাম কিবরিয়া

দিনটি আমার ঠিক মনে নেই। তবে ওটা ১৯৮৩ সালের গোড়ার দিকের ঘটনা। আমি তখন মেরিন একাডেমির সিনিয়র ক্যাডেট। থাকি মিজেন টপ (Mizzen Top)-এ। নিচ তলার লিডিং ক্যাডেটের রুমে।

একদিন হঠাৎ করেই রহমানস্যার আমাকে অপছন্দ করে ফেললেন। কেন, কিভাবে আমার জন্য তার অপছন্দটা অঙ্কুরিত হলো, কিভাবেই বা তা ফুলেফেপে উঠলো – সেটা আজো আমার কাছে দুর্বোধ্য। তবে যা হাড়ে হাড়ে বুঝলাম তা হলো তিনি আমার চেহারাটাই অপছন্দ করে ফেলেছেন। আমাকে দেখলেই কেমন দাত কটমট করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকেন। খুব কাছে গেলে *কটমট* শব্দটাও শোনা যায়! ক্লাসে ইচ্ছে করেই আমাকে কঠিন কঠিন প্রশ্ন করেন। স্যারকে দেখে যেন কিছুই বুঝিনি এভাবে ঠাস ঠাস করে স্যালিউট দিয়ে যেতে থাকলাম।

যাহোক, ওসব স্যালিউটে কোনো কাজ হলো না। তিনি আমার লিডিং ক্যাডেটের পোস্টটা বাতিল করে দিলেন। কলার ফ্ল্যাশ দুটো খুলে মাথা নিচু করে জিআই (GI) মি. গফুরকে ফেরত দিলাম। তারপর তিনি আমাকে হলুদ ব্যান্ড পরালেন। তাও বাচোয়া, লাল ব্যান্ড দেননি।

সাত দিন খুব শাস্তি পেলাম। ভাবলাম স্যারের রাগ শিথিল হয়েছে। কিন্তু না।

আমার এসব দুর্দিনে আরেকজন আমার পাশে ছিল। সে হলো সোমেল আবু তায়েব রাহমান সাঈদ। সে এবং আমি দুজনে একই পরিমাণ শাস্তি পাচ্ছিলাম। সোমেল এখন আর পৃথিবীতে নেই। তার প্রথম সি ভয়েজটাই শেষ হয়েছিল পরপারের ঘাটে। আমেরিকার এক বন্দর থেকে *বাংলার বাণী* জাহাজ রওনা হবার

একদিন পর আটলান্টিক সমুদ্রে হারিয়ে গিয়েছিল সোমেল। কেন, কিভাবে তা আজ পর্যন্ত রহস্য ঘেরা হয়ে আছে আমাদের কাছে। সোমেল নেই, আমি বেচে আছি।

রহমানস্যার সর্বশেষ যে প্রতিশোধটা আমাদের ওপর নিলেন তা হলো, আমাদের দুজনের ক্লাসের রেজাল্ট তিনি রহিত ঘোষণা করলেন। চব্বিচশজন ক্যাডেটের মধ্যে সোমেলকে করা হলো তেইশতম আর আমাকে চব্বিশতম। পাসের ক্লাস দেয়া হলো পাস ক্লাস। অথচ আমরা দুজনেই এক থেকে পাচের মধ্যে ছিলাম। ফার্স্ট ক্লাসের মার্কস ছিল আমাদের। চব্বিশতম মানে আমার পরে আর কোনো নাম নেই লিস্টে।

তখনকার দিনে বাংলাদেশ শিপিং কর্পরেশন (বিএসসি) ছিল এলিট জাহাজ কম্পানি। ইনডিয়া, পাকিস্তান, শ্রীলংকা থেকে অফিসাররা চাকরি নিতো বিএসসি-তে। জাহাজের জীবনে ছিল হাসি আনন্দে উপচে পড়া এক গ্ল্যামার। তবে সব জাহাজের জীবন এক রকম ছিল না। পাসিং আউট হবার পর গোল্ড মেডালিস্টকে চয়েস দিতো বিএসসি। সেই বলে দিতো আমি অমুক জাহাজে উঠবো। এরপর সিলভার মেডালিস্ট বলতো আমি অমুকটাতে। এভাবে সিরিয়ালি সবাই ভালো ভালো জাহাজগুলো বুক করে ফেলতো। রহমানস্যারের ক্রোধের ছায়া কর্ণফুলির ওপারের জুলদিয়ার পাহাড় থেকে আমাকে অনুসরণ করে বিএসসির পাইন ভিউ অফিসে এসে হাজির হলো।

যিনি প্রাথমিকভাবে ক্যাডেটদের জাহাজ এলোকেট করেন সেই আফসার আমাকে বললেন, কিবরিয়া, এতো অধৈর্য হবেন না। আপনি জাহাজ পাবেন ঠিকই তবে সবার শেষে।

ওদিকে বিদেশে পাড়ি জমানোর জন্য আমার হৃদপিণ্ডটা তখন হাসফাস করছে। যে পৃথিবী দেখার জন্য এতো কষ্ট করলাম, জুনিয়র লাইফে সিনিয়রদের হাতে অমানবিক *রগড়া* খেলাম, সিনিয়র হয়ে আবার স্যারের হাতে পানিশমেন্ট পেলাম সেই বিদেশ ভ্রমণটাই যেন কোথায় এসে বার বার আটকে যাচ্ছে, ফশকে যাচ্ছে।

আগস্টের ২০ তারিখ জাহাজে উঠলাম। নাম *বাংলার উপহার*। মেরিট লিস্টে চব্বিশ নাম্বার ছাত্র আমি। চব্বিশজন ক্যাডেটের মধ্যে চব্বিশ হবার গর্ব আমার। আমাকে দেয়া হয়েছে সবচেয়ে ভাঙা-চোরা জাহাজটায়। উপহার কথাটা খুবই বেমানান ভেবে প্রথম দিনেই নাম পাল্টে রাখলাম বাংলার অপহার।

গ্যালি (Galley)-র ঠিক উল্টো দিকে আমার ক্যাবিন। ছোট এবং গরম। এসি নেই। তার পরিবর্তে প্রতি বাংকে একটা করে ছোট ফ্যান। দেখলে মনে হয় খেলনা - এতো ছোট। টেবিলে একটা টেবিল ফ্যান। আমার সঙ্গে আমার রুমে থাকবে বন্ধু আবুল হোসেন। আমি যদি মূষিক তো সে পর্বত। ছয় ফিট দুই ইঞ্চি লম্বা ও চওড়া কাধ। টার্মিনেটর ছাড়া কিছু বলা যাবে না ওকে। খেতে বসলে আমি যা খাই সে খায় তার দশগুণ।

প্রথম দিন এসেই আবুল বললো, তুই উপরের বেডে থাকবি, আমি নিচে থাকবো।

এ ব্যাপারে আমার অনড় সিদ্ধান্ত তাকে জানিয়ে দিলাম।

শেষে সে উপরের বাংকে যেতে রাজি হলো এই শর্তে যে, প্রতি মাসে বাংক পরিবর্তন হতে হবে। অর্থাৎ এক মাস পর আমাকে উপরের বাংকে ঘুমাতে হবে।

আমি তাতেই খুশি। এক মাস অনেক লম্বা সময়। কোথাকার পানি কোথায় গড়াবে ততোদিনে!

জাহাজে বসবাস করলে অনেকগুলো অসুবিধাকে মেনে নিয়ে চলতে হয়। তার মধ্যে একটা হলো এর দুলুনিটা। দুলুনিগুলো অনেক প্রকার। প্রত্যেকের আবার আলাদা আলাদা নামও আছে। যেমন ডানে-বামে দুললে তাকে বলে *রোলিং* (Rolling)। সামনে-পেছনে দুললে তাকে বলে পিচিং (Pitching)। আর উপর-নিচে নাচলে তাকে বলে *হিভিং* (Heaving)।

একদিন ঝড়ের সময়ে যখন জাহাজ খুব দুলছে। হঠাৎ খেয়াল করলাম আমার উপরের বাংকটা একদিক থেকে খুলে আসছে। রাত তখন গভীর। বাংকটাতে মচমচ শব্দ হচ্ছে। দেখতে দেখতে অনেকটা অংশ খুলে

গেল। ততোক্ষণে বুঝতে পেরেছি এটা স্বপ্ন নয়। লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে দাড়ালাম। উপরের বাংকে বন্ধু আবুল হাত পা ছাড়িয়ে নাক ডেকে ডেকে ঘুমাচ্ছে। তাকে অনেক ডাকলাম।

উত্তরে সে একবার বলে হুহ, একবার বলে রাখতো, একবার বলে দাড়া ব্যাটা।

এভাবে সে একটা করে ঘুম জড়ানো দুর্বোধ্য শব্দ ছুড়ে দিয়ে বার বারই ঘুমের অতলে তলিয়ে যেতে থাকে। ততোক্ষণে বেডটা পেছনের দেয়াল থেকে অনেকটাই নিচে নেমে এসেছে। দাত পরার আগে যেমন একটুখানি লেগে থাকে, খুব অস্বস্তিকর অবস্থা সৃষ্টি করেও দুই তিন দিন ঝুলে থাকে, বাংকটার অবস্থাও সে রকম। আবুলের পায়ের দিকটা প্রায় এখন মাথার দিক থেকে দুই ফিট নিচে নেমে গেছে। সে এখন একটা অদ্ভুত রকম ইনক্লাইন্ড হয়ে বেডে শুয়ে আছে। হঠাৎ দেখলে মনে হবে অপারেশন থিয়েটারের যান্ত্রিক বেড।

আমি আর বিছানায় গেলাম না। যদি ঘুমন্ত অবস্থায় সেটা খসে আবুলসহ আমার ওপরে পরে তাহলে এই মাঝ সমুদ্রে ঝড়ের ভেতর সলিল সমাধি না হয়ে আমার আবুল সমাধি হবে।

ভোরে চিফ অফিসারের কাছে গেলাম বৃজে। খুব ইনিয়ে-বিনিয়ে বুঝালাম কিভাবে এক ভয়াবহ বিপদ থেকে একটুর জন্য বেচে এসেছি।

তিনি কাশ্মিরের মানুষ। খুব মিশুক এবং মানবিক। সেসব দিনে একজন চিফ অফিসারের সামনে একজন ক্যাডেট ছিল মাত্র *এ লাম্প অফ শিট*। খারাপ শোনাতে পারে, তবু ওটাই হতো সদ্য পাস করা ক্যাডেটের উপযুক্ত উপাধি।

তবে মি. রাও আমার কথায় গুরুত্ব দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বৃজে থার্ড অফিসারকে রেখে নিচে নেমে এলেন।

আমি তো মহা খুশি। এবার আবুলকে বহিষ্কার করবো। পাশের গ্যালিতে একটা এডিশনাল থার্ড ইঞ্জিনিয়ারের ক্যাবিন খালি পরে আছে। হয় আবুল ওটাতে যাবে, না হয় আমি যাবো। তবু এভাবে ছোট একটা ক্যাবিনে গালিভারের সঙ্গে গাদাগাদি করে থাকা যায় না।

আমি আগে, চিফ অফিসার পিছে। দরজা খুলে দেখি বাংক খালি। আবুল উধাও। ঘড়ি দেখলাম সাড়ে ছয়টা। অর্থাৎ আবুল ঘুম থেকে ওঠে ডিউটিতে চলে গিয়েছে।

যাহোক, চিফ অফিসারকে দেখালাম বাংকটার অবস্থা। ভাবলাম তিনি বলবেন, আজই কার্পেন্টারকে দিয়ে ওটা খুলে ফেলবো। আর তোমরা দুজন থাকবে দুই ক্যাবিনে। কিন্তু চিফ অফিসার একটু চিন্তা করে যা বললেন তা শুনতে আমি মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না।

তিনি বললেন, হু, স্লিপস অন টপ?

স্যার, আবুল স্যার। আমি আনন্দে গদ গদ।

ফ্রম টুমরো ইউ উইল স্লিপ অন টপ। হি ইজ ব্লাডি টু হেভি।

আমার আবুল-সমাধি হলো যেন। আমি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম ভদ্রলোকের দিকে। তিনি আমার স্তম্ভিত ভাবটার অন্য অর্থ করলেন। আমাকে আশ্বস্ত করে বললেন, ডোন্ট ওয়ারি, আই উইল হ্যাভ ইট রিপেয়ার্ড।

আমি কিছু বললাম না। শুধু হুম বলে ওনাকে বোঝালাম যে, তার কথা বুঝেছি।

দুপুরের লাঞ্চের সময় আবুলের মুখে হাসি যেন আর ধরে না। আমি মনের কষ্ট মনে পুরে এমন একটা ভাব করলাম যেন আজ হোক, কাল হোক উপরের বাংকে তো আমাকে যেতেই হতো। তা এখন যাওয়াটা আর এমনকি!

আবুল এখন নিউ ইয়র্কে। আমাকে মাঝে মধ্যে ফোন করে। তবে বাংলার উপহারের গল্প সে বেশি একটা করতে চায় না।

মোহাম্মদপুর, ঢাকা থেকে

ধস

– প্রেম

তখন ১৯৮৬ সাল। আমার বয়স তখন প্রায় দুই বছর। আমাদের বাড়ি চাপাইনবাবগঞ্জ জেলায় মহানন্দা নদীর ধারে নিমগাছি নামের একটি গ্রামে। এখন নদীগুলো শুকিয়ে গেলেও দশ বারো বছর আগে নদীর রূপ এমন ছিল না। নদীগুলো এখন দেখে মনে হয় যে, নদী তাদের যৌবনকাল শেষ করে বার্ধক্যে উপনীত হয়েছে।

আগে নদীতে সব সময় থাকতো প্রচণ্ড রকমের স্রোত। বর্ষার সময় সেটা আরো ভয়ংকর রূপ ধারণ করতো। স্রোতের তোড়ে নদীর পাড় ভেঙে যেতো। এখন নদীর সে জায়গাগুলো বাধানো হলেও সেই সময় নদীগুলো বাধানো ছিল না। তাই এলাকাবাসীরাই নদী ভাঙন রোধের চেষ্টা করতো। সেই চেষ্টা স্বরূপ বড় বড় বাশ নদীর পাড়ে পানির ওপর থেকে নিচে ঢুকিয়ে রাখতো। নদী তখনো ভয়াল রূপ ধারণ করেনি।

ইতিমধ্যে আমাদের পরিবারের মধ্যে দিয়ে এক ঝড় বয়ে গেছে। বড় চাচা, মেজ ফুপু ও মেজ চাচার এক মেয়ে মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানে আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। তিনজনের মৃত্যু শোক আমাদের পরিবার তখনো পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেনি। এমন সময় ঘটলো আরো একটি দুঃখময় ঘটনা। আমি তখন নানাবাড়িতে। আম্মা আমাকে রেখে এসেছেন বুকের দুধ ছাড়ানোর জন্য। কিন্তু ক্ষুদ্র এই আমি কি বুঝতে পেরেছিলাম যে, শুধু বুকের দুধ নয় – মাকেও হারাতে হবে।

আম্মা একদিন গোসল করতে গেছেন নদীতে, সঙ্গে বড় ভাইয়া।

বড় ভাইয়া আম্মাকে বলছেন, আজ নদীর পাড়টা যেন কেমন লাগছে। মনে হচ্ছে ধ্বসে পড়বে।

আম্মা বলেন, আরে না, ধসবে না। এতো অল্প বয়সে কেউ মৃত্যুর ভয় করে নাকি?

ভাই বলেন, দাড়ান, আমি একটু উপর থেকে দেখে আসি। ভাইয়া পাড় দেখার জন্য যখনই উপরে উঠেছেন তখনি পাড় ধসে গেছে।

পাড় ধসে পড়তে দেখে আম্মা যেখানে দাড়িয়েছিলেন সেখান থেকে দূরে লাফ দিয়েছেন। কিন্তু আম্মা তবুও বাচতে পারেননি সেই আঘাতের হাত থেকে। কারণ পাড় ধসের হাত থেকে বাচার জন্য লাফ দিয়ে পড়েছেন সেই বাশের উপর যা নদীর পাড় ভাঙা রোধের জন্য দেয়া আছে। আম্মা বাশের ওপর এমন ভাবে পড়েছেন যে, বাশের একটি মাথা আম্মার বুকে আঘাত করে। সেই একটি আঘাতই আম্মাকে আমাদের কাছ থেকে চিরদিনের মতো সরিয়ে দিয়েছে। আমরা হয়ে গেলাম মাহারা। বঞ্চিত হলাম মায়ের স্নেহ–ভালোবাসা থেকে।

সৎ মা থেকে দূরে রাখার জন্য আব্বা আজও দ্বিতীয় বিয়ে থেকে বিরত আছেন। প্রায় আঠারো বছর থেকে তিনি নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করছেন। যদিও তার বয়স এখন পঞ্চান্ন।

নদীমাতৃক এই দেশ। নিঃসন্দেহে নদী এ দেশের মানুষকে অনেক কিছু দিয়েছে। লাখো কোটি মানুষের জীবিকা এই নদীর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। নদী ছাড়া এ দেশের কথা কল্পনাই করা যায় না। কিন্তু নদী আমার যে ক্ষতি করেছে তা অপূরণীয়। নদী আমার জীবনে যে স্মৃতি তৈরি করেছে তা কখনো ভোলা যাবে না।

রাজশাহী থেকে

আজব গল্প

– মোহাম্মদ গোলাম হোসেন

পেশায় আমি একজন নাবিক। আমার সব ডায়রি খুজে নৌপথ ভ্রমণ সম্পর্কে যদি হাজার পৃষ্ঠাও লিখি তবে শেষ করা যাবে না। যাক, এবার আসি আসল কথায়।

আমার চাচাতো ভাই–বোনের এক মামা বিদেশি জাহাজে চাকরি করতেন। ছোটবেলায় যখন চাচাতো ভাই–বোনের সঙ্গে খেলতে বা গল্প করতে বসতাম তখন তারা বলতো, আমার মামা যে জাহাজে চাকরি করেন সেটা

অনেক বড়। দশ বারো তলা জাহাজ। জাহাজ যখন সাগরে চলে, মাঝে মধ্যে ছোট একটা ইচা (চিংড়ি) মাছ জাহাজের লঙ্গর কামড়াইয়া ধরে রাখে। তখন জাহাজের লোকজন দুই বস্তা আটা অথবা ময়দা বা একটা ছাগল সাগরে ফেলে দিলে জাহাজ ছেড়ে দেয়।

একটা গল্প তাদের কাছ থেকে শুনতাম। সাগরে যখন জাহাজ চলে তখন এক হাতে ডাকে, অন্য হাতে নিষেধ করে। ছোটবেলায় তাদের কাছে এসব গল্প শুনতাম এবং ভাবতাম হায়, জীবনে যদি এসব জাহাজ একবার দেখতাম!

১৯৯৩ সালে প্রথম চট্টগ্রামে বেড়াতে আসি। তখন আমি ক্লাস টেন-এর ছাত্র। চট্টগ্রাম আসার পথে কুমিরার পশ্চিম পাশে প্রথম জাহাজ দেখলাম। তখন ছোটবেলার চাচাতো ভাই-বোনের কথা মনে পড়লো। মামা সম্ভবত এসব জাহাজে চাকরি করেন।

যাক ছোটবেলার জাহাজ দেখার স্বপ্নটা আমার পক্ষে সাড়া দিল।

১৯৯৫ সালে জাহাজে চাকরির জন্য পরীক্ষা দিয়ে সফলতা অর্জন করি। অবশ্য তখন ওই মামার সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় এবং আমাকে জাহাজে চাকরির ব্যাপারে বেশ বুদ্ধি-পরামর্শ দেন।

সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং ট্রেনিং সমাপ্ত করার পর এলো আমার জাহাজে যোগদানের পালা। কম্পানি অফিস থেকে আমাকে বলা হলো, জাহাজে যোগদান করতে হবে জাপানের নাগোয়া শহরে।

তখন ভাবতে থাকি, সত্যি সত্যি কি আমি জাপানে গিয়ে জাহাজে যোগদান করবো! দ্বিতীয় আনন্দের বিষয় হচ্ছে আমি যে জাহাজে যোগদান করবো সেটা নতুন, শিপ বিল্ডিং থেকে নামবে। জাপানে গিয়ে জাহাজে যোগদান করবো এবং প্রথমবারেই নতুন জাহাজ, দুদিকের আনন্দে আমার দিন আর শেষ হয় না।

অবশেষে সব কিছুর অবসান ঘটিয়ে এসে গেল আমার ফ্লাইট শেডিউল। আমার ফ্লাইট হবে ২০ মে ১৯৯৭। ফ্লাইট হচ্ছে ঢাকা-ব্যাংকক-সিউল-নাগোয়া। ২১ মে আমরা চোদ্দজন বাংলাদেশি এক সঙ্গে ফ্লাইটে জাপানের নাগোয়াতে পৌছি। নাগোয়াতে আমরা একদিন হোটেলে ছিলাম। ২২ মে জাহাজের কাজে যোগদান করলাম।

জাহাজটি ছিল বেশ বড়। দুইশ আশি মিটার লম্বা। ধারণ ক্ষমতা এক লাখ আশি হাজার মেট্রিক টন। জাহাজ প্রথমবারে যাবে অস্ট্রেলিয়া।

অস্ট্রেলিয়া যাবার পথে দেখলাম জাহাজের পাশে হাজার হাজার ডলফিন খেলা করছে। অস্ট্রেলিয়া পৌছার পর এ্যাংকর পজিশনে দেখলাম অনেক তিমি সাগরে খেলা করছে। জাহাজ থেকে অবশ্য একটু দূরে। এভাবে জাহাজ চলছে জাপান এবং অস্ট্রেলিয়া রুটে।

বেশ কিছু দিন আমার ভালোই কাটলো। কিন্তু ছোটবেলার চাচাতো ভাই-বোনের সেই কথাটি আমার মনে রয়ে গেল। একদিন চা খাওয়ার সময় সবাই যখন এক সঙ্গে চা খেতে বসলাম তখন আমার ঊর্ধতনদের বললাম, ভাই, শুনেছি জাহাজ যখন সাগরে চলে, ছোট একটা ইচা মাছ জাহাজের নোঙ্গর কামড়ে ধরে রাখতো। তখন জাহাজের লোকজন দুই বস্তা আটা অথবা একটা ছাগল সাগরে ফেলে দিলে জাহাজ ছেড়ে দেয়। কিন্তু আমি তো গত তিন চার মাসে এ ধরনের কোনো আলামত দেখিনি।

আমার এ কথা শুনে সবাই আমাকে নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ হাসাহাসি করলো। পরিশেষে বললেন, আমরাও তোমার মতো এ রকম শুনেছি। এর সঙ্গে বাস্তবতার কোনো মিল নেই। এসব আজব গল্প।

যাক, আজ পর্যন্ত ছয়টি জাহাজে চাকরি করলাম। পৃথিবীর কোথাও কোনো সমস্যায় পড়িনি। পৃথিবীর প্রায় সত্তর আশিটি দেশে চাকরির সুবাদে গেলাম। তবে এখনো দেশে গেলে মাঝে মধ্যে দুই একটা লোক ওই ধরনের আজব গল্পের প্রশ্ন করে।

সিংগাপুর থেকে

প্রেমের মরা জলে ডোবে না

– মুহম্মদ ছাদেক আলী

নাজিরপুর খালের ধারে পুরনো এক গাব গাছ। তার ছায়ার তলে বসা এক ভিখারিনী। জীর্ণ–শীর্ণ কংকালসার দেহ। শাদা ধবধবে মাথার চুল। ভ্রূ পর্যন্ত শাদা হয়ে গেছে। কালো কুচকুচ গায়ের রঙ। সাহায্যের আশায় সামনে একটি টিনের পাত্র। বাড়ি ফেরার পথে আমি একটি এক টাকার মুদ্রা ফেলতেই ঠন করে আওয়াজ হলো।

খুশি হয়ে বৃদ্ধা বললো, *ভগবান তোমার মঙ্গল করুন বাবা, লাখের পরমাই দেউক।*

ভগবান বলতে বিস্মিত হলাম। মনে মনে বললাম, এতো মুসলমান না, হিন্দু। এ এলাকায় নতুন। এক সপ্তাহ ধরে এসেছে। সবাই বুড়ি বলে ক্ষেপায়।

জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার নাম কি?

আমার নাম দিয়ে কি করবে বাবা! আমার ভবে কেউ নেই। আমার নাম কলংকের কালিতে ঢেকে গেছে।

বৃদ্ধা হলে কি হবে, গলার স্বর এখনো ঠিকই আছে। গলার স্বর শুনে ঠাহর করতে পারলাম, এতো নাজিরপুরের হারিয়ে যাওয়া সরকার বাড়ির কালী, দীর্ঘ দিন যাবৎ যার খোজ মেলেনি। মদনমাঝির খোজে চল্লিশ বছর আগে ঘর থেকে বের হয়ে গিয়েছিল, আর দেশে ফেরেনি।

আচ্ছা, তুমি সত্যি করে বলো, তুমি সতীশ সরকারের মেয়ে কালী না?

নাম শুনে হাউমাউ করে কেদে উঠলো বুড়ি।

তা এতোকাল প্রায় চল্লিশ বছর কোথায় লুকিয়ে ছিলে?

চোখের জল মুছে, দম নিয়ে বুড়ি বললো, মদনের মৃত্যু সংবাদ শুনে তার খোজে ঘর থেকে বের হলাম। গয়া–কাশি–বৃন্দাবন ভ্রমণ করলাম। পদ্মা, মেঘনা, যমুনায় তার লাশ খুজলাম। কিন্তু কোথাও তার লাশের খবর পেলাম না।

কিছু শুনলেও না?

না। কেউ কিছু বলতে পারলো না। তাই তো ভাবি, আমার মদনমাঝির মরদেহ কোথাও ভেসে উঠলো না কেন? তাহলে আমার প্রেম কি মিথ্যা ছিল বাবা? আমার মদনের দেহ জলে ভেসে উঠলো না কেন?

আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে নাজিরপুর খালের অবস্থা এ রকম করুণ ছিল না। গঙ্গা থেকে পদ্মা, পদ্মা থেকে ইছামতি, ইছামতি থেকে কালিগঙ্গা, কালিগঙ্গা থেকে ধলেশ্বরী, ধলেশ্বরী থেকে জলধারা নাজিরপুরের খাল দিয়ে বুড়িগঙ্গায় গড়াতো, তারপর জলরাশি বঙ্গোপসাগরে পড়তো। তখন ফারাক্কা ও অন্যান্য নদীর মধ্যে বাধ দেয়া হয়নি। এ নাজিরপুরের খালটিতে তখন বড় বড় পানশি নৌকা ও মোটর লঞ্চ চলতো। নাজিরপুরের খাল বর্ষায় ভরে যেতো। বর্ষায় পাড় উপচে পানিতে সয়লাব হয়ে যেতো। তখন নৌকা ছাড়া যাতায়াতের কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। নৌকাই ছিল যাতায়াতের একমাত্র বাহন। তখন গাড়ি চলার জন্য আধুনিক রাস্তাঘাট সৃষ্টি হয়নি, হয়নি জলপথ অচল করার জন্য বৃজ।

নাজিরপুর ছিল কলাতিয়া ইউনিয়নের সবচেয়ে সেরা গ্রাম।প্রতি ঘাটে বাধা থাকতো ডোঙা, নৌকা ও বাইচের নৌকা। এ গ্রামে তখন চল্লিশ হাত থেকে একশ হাত পর্যন্ত নৌকা প্রস্তুত করা হতো। এ গ্রামের আবদুল শরীফ ও মর্তুজ আলী বাইচের নৌকার মালিক ছিলেন। তারা ঢাকায় নৌকা বাইচের প্রতিযোগিতায় বড় লাটের ট্রফি জিতেছিলেন এক সময়।

বর্ষা এলেই এখানে আনন্দের বান ডাকতো। সারা বর্ষা ধরেই নৌকা বাইচ চলতো। বাইচের নৌকার টিকাড়া ধ্বনিতে তাদের রক্তে নাচন ধরতো।

বাংলাদেশ পানির দেশ। সংক্রান্তি দিন থেকে মনসা দেবীর পূজা আরম্ভ হতো। মনসা দেবীর মূর্তি কিনে এনে বাড়িতে স্থাপন করতো। পহেলা ভাদ্র থেকে নৌকা বাইচ আরম্ভ হতো। বাইচের প্রতিযোগিতা আরম্ভ হতো মরিচা, মাহতাবপুর, রোহিতপুর, বেউতা, গুইটা ও ভাংগাভিটায়। তখন লোকেরা দিনভর নৌকা বাইচ খেলতো আর রাতে বেহুলা সুন্দরী, মদনকুমার ও পাউচাচোরার গান শুনতো।

নবাবগঞ্জ, দোহার ও কেরানিগঞ্জের মধ্য স্থানে অবস্থিত ভাংড়াভিটা। বিরাট নৌকা বাইচের আড়ং। নানান শ্রেণীর দর্শকদের এ বাইচে সমাগম হতো এবং নানান আনন্দ–ফুর্তি করতো। এটি ছিল ঢাকা জেলার বর্ষার আনন্দের মহা সম্মেলন। এ বাইচে চারদিকে আন্দন্দের ধুম পড়ে যেতো। চারদিকে মোটর, লঞ্চ, বাইচের নৌকা, জেলেদের মাছ ধরার নৌকা, ডোঙা এসে আড়ং ভরে যেতো। তিন উপজেলার এটি ছিল আনন্দের মহা সম্মেলন।

শৌখিন লোকেরা নৌকা ভাড়া করে প্রিয়জনদের নিয়ে এ বাইচ দেখতে আসতো। তাতে প্রচুর খাবার–দাবার ব্যবস্থা থাকতো। সর্বক্ষণ খেতো এবং ফুর্তি করতো।

তাশ খেলার পার্টিরাও বাইচে আসতো। বাড়ি থেকে নৌকায় উঠে তাশ খেলা আরম্ভ করতো। বাইরে একবারও দেখতো না। বাইচ শেষে বাড়ি ফিরে ঘুমিয়ে থাকতো। নৌকা বাইচ উপলক্ষ করে খাওয়া–দাওয়া ও তাশ খেলাই তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

গ্রামের কৃষক শ্রেণী খোলা নৌকা ও ডোঙায় করে বাইচে আসতো। জেলে ও হিন্দু রমণীরা মাছ ধরার খোলা নৌকায় সেজে–গুজে বাইচ দেখতে আসতো। বর্ষার ফুল কদম। তাই যুবতীরা কদমের মালা গলায় পরতো সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য।

এ আনন্দে চ্যাংড়া ছেলেরাও কম যেতো না। তারা পোলাও খাসি খেয়ে লঞ্চের ছাদে মাইক বেধে, হিট গান বাজিয়ে আনন্দ করতো।

গান পাগল প্রেমিকরা বাইজি, হারমোনিয়াম ও তবলা নিয়ে বাইচে আসতো। বাইজি নাচতো আর তারা শুয়ে শুয়ে আনন্দ করতো এবং গানের সঙ্গে তালি দিতো।

হায়রে পিতলের কলসি
তোরে লইয়া যাবো যমুনায়।
যখন উঠে যৌবন জ্বালা
যাইত্তা ধরি কলসির গলা
জলের ছায়ায় যৌবন দেখা
যায় লো পিতলের কলসি,
তোরে লইয়া যাবো যমুনায়।

নাজিরপুরের সতীশ সরকারের ছিল তিন মেয়ে। কোনো ছেলে সন্তান ছিল না। সামান্য গৃহস্থ। তার সংসার কোনো প্রকারে চলতো। সতীশ সরকার ছিলেন কালো। আর তার স্ত্রী কমলা ফকফকে শাদা সুন্দরী। প্রথম দ্বিতীয় মেয়ে পেয়েছিল মায়ের গায়ের রঙ শাদা। এবং তৃতীয় মেয়ে হয়েছিল বাবার মতো কালো। তাই তার নাম রাখা হয়েছিল কালী। যৌবনে পা দিতে না দিতেই প্রথম ও দ্বিতীয় মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল। কিন্তু কালীর বিয়ে হলো না কালো বলে। তাই সবাই তাকে অপয়া বলে ভাবতো। কেউ আদর করতো না।

কালীর বিয়ের আগেই মা কমলা হঠাৎ মারা গেল।

সতীশ সরকার বড়ই বিপাকে পড়ে গেলেন। অর্থ কষ্টে কোনো প্রকারে কালীকে নিয়ে সংসার চালাতে লাগলেন। সংসারে কালীকে দেখার আর কেউ রইলো না। পাশের বাড়ির মদন টাকার বিনিময়ে তার কাজকর্ম করে দিতো। তাই মদনকে সে খুব ভালোবাসতো।

মদনেরও বাবা–মা কেউ ছিল না। স্নেহ বঞ্চিত। খালার কাছে মানুষ। মদন ছিল সুঠাম দেহের অধিকারী। মাথায় কোকড়ানো বাবড়ি চুল। বর্ষাকালে নৌকায় বাইচ খেলে সুনাম অর্জন করেছিল। সোজা–শান্ত। সবাই তাকে চিনতো। মদন যে নৌকায় মাঝি হয়ে বাইচ খেলতে যেতো সে নৌকাই আড়ঙে প্রথম হতো। তাই বর্ষা এলেই মদনকে নিয়ে নৌকার মালিকদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যেতো।

মদন নৌকার সামনে গলুই–এ বসে বলতো, *চেলা লেলা, চেলা লেলা হেইও।*

নৌকা সকল বাইচারা এক সঙ্গে বলতো, *চেলা লেলা, চেলা লেলা হেইও।*

মদন পিতলে বাধানো লম্বা বৈঠা ঘোরাতে ঘোরাতে বলতো *আহা বেশ বেশ বেশ।*

সকল বাইচারা নৌকার মাথা কাঠে বৈঠা ঠকে সমস্বরে বলতো, আহা বেশ, বেশ, বেশ!

হিল্লার মাথায় এসে বাইচাদের উৎসাহিত করার জন্য মদন বলতো, *ছিড়া ফ্যালা ছিড়া ফ্যালা।*

বাইচারা সমস্বরে বলতো, *ছিড়া ফ্যালা, ছিড়া ফ্যালা।*

মদনের নৌকা হিল্লার মাথায় গিয়ে প্রতিযোগিতায় প্রথম হলো। তখন মদনের কেরদানি দেখে কে! পাকা মিঠাই, রসগোল্লা, পান–বিড়ি খেয়ে মুখ লাল করে সারি গান গেয়ে বাড়ি ফিরতো। খালের দুই পাশের মানুষ চেয়ে চেয়ে তাদের দেখতো।

কালো মেয়ে নিন্দা কইরো না, সবজানের মা
কালো মেয়ে নিন্দা কইরো না।
কালো মেয়ে হলে পরে
মা বাপে ভাবনা করে
তার বুঝি পরে নিবে না।
জামাই এলো বাড়িতে
চাল নেই হাড়িতে
কালো মোরগা ধরা দিল না।

মদন বাইচে বিজয়ী হয়ে সতীশ সরকারের বাড়িতে দেখা করতে গেল। স্ত্রী কমলা কিছু দিন আগে মারা গেছে।

অসুস্থ সতীশ সরকার শুয়ে আছেন। কালীর ভবিষ্যতের কথা মদনের সঙ্গে আলাপ করলেন। তাকে দেখে অনুরোধ করলেন।

কালীও ঘরে বসে গাদাফুলের মালা গাথছে। মদন ও ঘরে গেলেই কালী ফুলের মালা তার গলায় পরিয়ে দিল। পায়ে ধরে প্রণাম করতে গিয়ে পা ধরে কাদতে লাগলো। কাদতে কাদতে মদনের দুই পা চোখের জলে ভিজিয়ে দিল।

মদন কালীকে উঠিয়ে বুকে ধরলো। তবু কান্না থামে না। কালীর কান্না দেখে মদনের মন গলে গেল। দুই হাতে মুখ ধরে বললো। তুমি এভাবে কাদছো কেন কালী? আমি তো এ কান্না সইতে পারছি না।

আমার এ দুনিয়াতে কে আছে? কে আমায় ভালোবাসবে?

কেন, আমি আছি। আমি তোমায় ভালোবাসবো।

তাহলে আগামীকাল রাতে তুমি আমাকে নিয়ে বেড়াতে যাবে তো?

ঠিক যাবো। তুমি বসে থেকো। সন্ধ্যার পর আমি নৌকা নিয়ে আসবো।

ভাদ্র মাস। বর্ষার পানি চারদিকে উছলে পড়ছে। পথঘাট পানিতে ভরে গেছে। গাছে গাছে কদম ফুল ফুটছে। চারদিকে জলে টইটম্বুর। কালীর শরীরেও তার ছোয়া লেগেছে। মদনমাঝি কালীকে বেড়াতে নিয়ে যাবার জন্য ছোট নৌকা নিয়ে এলো।

পূর্ণিমার রাত! চারদিকে জ্যোস্না ফট ফট করছে। কালী আজ এমন সাজে সেজেছে, কাপড়ে যেন তার যৌবন ধরে রাখতে পারছে না।

চারদিকে মাতাল বাতাস। মাঠের প্রান্তে হিজল গাছের সঙ্গে নৌকা বেধে রেখে মদন মাঝি বললো, তুমি আমার কাছে আজ থেকে কালী নও, তুমি আমার কলোরানী। আমি তোমায় ভালোবাসি কালোরানী।

একি কথা বললে মাঝি? কালোকে তো কেউ ভালোবাসে না। বিয়ে করতে চায় না।

কালোর আবার রূপ আছে নাকি? কালোই তো আসল রূপ। মাঝি বললো আস্তে করে।

এমন সময় এক খণ্ড কালো মেঘ এসে আকাশটা ঢেকে দিল। সবই অন্ধকার, কালো হয়ে গেল। তখন মাঝি বললো, অন্ধকারে কালো-শাদার প্রভেদ ঘুচে যায়। কালোই আদি রূপ। তুমি কালো, তুমি আমার কালোরানী। মহারানী। কাছে এসে বসো। আজ তোমাকে ভালোবাসবো, দুই নয়ন ভরে দেখবো।

রানী নৌকার মাঝখানে এসে বসলো। হাত ধরতেই মাঝির কোলে লুটিয়ে পড়লো।

মাঝি তার কপালে চুমু দিল। ঠোটে ঠোট রাখলো। বুকে ও সর্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে সোহাগ করলো।

আনন্দে রানীর চোখ বুজে গেল। আবেগে দেহ অবশ হয়ে পড়লো।

মাঝি বললো, তুমি আমার কালিগঙ্গা। আমি আজ অবগাহন করবো।

কালী কোনো উত্তর দিতে পারলো না। কোনো বাধাও দিল না। হঠাৎ ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি আরম্ভ হলো।

আজ ৫ ভাদ্র। বিখ্যাত ভাংগাভিটার নৌকা বাইচ। চারদিকে বাইচে যাবার সাড়া পরে গেছে। সকাল থেকেই নৌকা ছুটছে বাইচের দিকে। টিকাড়া ধ্বনি ও বাদ্যযন্ত্রে চারদিক মুখরিত।

দুপুর দুটার পর থেকে ছুটছে বাইচের নৌকা নানান বর্ণে সেজে। বাইচারা মাথায় লাল কাপড় বেধে, গায়ে রঙিন জার্সি পরে সারি গান গেয়ে চলছে। কোনো কোনো বাইচের নৌকায় নেজা, বল্লম কোচ দোলাতে দোলাতে ছুটছে। কেউ কেউ রামদা নিয়ে খেলা দেখাতে দেখাতে লাফাচ্ছে। অর্থাৎ বাইচে গণ্ডগোল করলে এক কোপে দুই ফাক এবং বল্লম দিয়ে গেথে ফেলবে। মদন চলছে সারেংদের একশ হাত বাইচের নৌকায় বাবড়ি চুল দুলিয়ে বৈঠা ঘোরাতে ঘোরাতে। তাকে দেখতে অদ্ভুত সুন্দর লাগছে।

বল্লম ও রামদা দেখে কালোরানীর পিলে ছ্যাৎ করে উঠলো। বাইচে যদি মদন মারা যায়? তাকে ছাড়া সে বাচবে কেমন করে? ভয়ে চোখে জল এসে গেল। আচলে জল মুছে ফেললো।

সন্ধ্যার পর সব নৌকা বাড়ি ফিরে এলো। এলো না শুধু সারেংদের নৌকা যে নৌকায় মদন মাঝি ছিল। গুজব ছড়িয়ে পড়লো বাইচের গণ্ডগোলে একজন লোক মারা গেছে। কে বা কারা মরেছে তার কোনো হদিস পাওয়া গেল না।

শত খোজাখুজির পরও মদনের কোনো খবর পাওয়া গেল না। মদনের খালা ও তার বৃদ্ধ অসুস্থ বাবা মদনের কোনো খোজখবর নিতে আগ্রহ প্রকাশ করলো না। লাশ কোথায়ও ভেসে উঠলো না। দুনিয়াতে কার খবর কে রাখে? তখন ঘর ছেড়ে বের হয়ে পড়লো কালোরানী প্রেমের মানুষটিকে খুজতে। দীর্ঘ চল্লিশটি বছর খুজে আজ এই অবস্থানে। *প্রেমের মরা জলে ডোবে না* বাউলের এ কথায় তার এখন আর কোনো বিশ্বাস নেই।

কলাতিয়া, কেরানিগঞ্জ, ঢাকা থেকে

সাহস

– রুমা

বিয়ের পর স্বামীকে নিয়ে বাবার বাড়ি যাওয়া হয়নি। কারণ স্বামী ব্যবসায়ী, ব্যস্ততা অনেক। পঞ্জিকা দেখে যাত্রা শুভ কবে বের করে স্বামীকে জানালাম।

স্বামীও কথা দিল এবার শত ব্যস্ততা থাকলেও আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে।

দূরের পথ। তাই সকাল থেকেই প্রস্তুতি নিলাম। লঞ্চে রাতের খাওয়ার জন্য টিফিন বক্সে রুটি ও ভাজি নিয়ে নিলাম। রিকশা করে রওনা হলাম লঞ্চঘাটে। মনে বইছে আনন্দের বন্যা। কতোদিন পর তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি। বাবা–মা কতো খুশি হবেন! লঞ্চে কোনো ক্যাবিন না পাওয়াতে ডেকেই চাদর বিছিয়ে শোয়ার ব্যবস্থা করলাম।

লঞ্চ চলছে, ধীরে ধীরে রাত বাড়ছে। পশ্চিম আকাশে হঠাৎ করেই কালো মেঘের পাহাড় গড়ে উঠলো। বিজলির আলোতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল মেঘনার উত্তপ্ততা ও উগ্রতা। বাতাসের তীব্রতা বাড়ছে, পড়ছে ফোটা ফোটা বৃষ্টিও। লঞ্চের সবার মধ্যে আতংকে।

হঠাৎ দেখা হলো স্বামীর এক বন্ধুর সঙ্গে। সেই বন্ধুটি আমাদেরকে তাদের ক্যাবিনে নিয়ে গেল। ক্যাবিনে আরো বেশি ভয় করছিল আমার। স্বামী নামের পুরুষটি আমার চেয়েও ভীতু। বাতাসের তীব্রতায় লঞ্চ দুলছিল। লঞ্চ জুড়ে চিৎকারের শব্দ। চারদিকে ছুটোছুটি হুড়োহুড়ি। কেউ কেউ লাফ দেয়ার জন্য জামা–প্যান্ট খুলে তৈরি হয়ে আছে। হয়তো সেই দলে আমার স্বামীও আছে।

হঠাৎ করেই আমার কাধে হাত রাখলো স্বামীর বন্ধু।

বললাম, একি, গায়ে হাত দিচ্ছেন কেন?

সে আমাকে জাপটে ধরলো।

তার থেকে ছুটতে গিয়ে হাতের শাখা ভেঙে গেল। লঞ্চটা তখন খুব দুলছে। এতোটা কাৎ হয়ে যাচ্ছে যে, আমিও ভয় পেয়ে যাচ্ছি। অথচ পাষণ্ড বন্ধুটির চোখে মুখে কোনো ভয় নেই। সে আমাকে নিয়ে জোরাজুরি করছে। শাড়ি খুলে ফেলে আমার বুকের ওপরটা পিষছে।

সবার চিৎকারের শব্দে আমার *বাচাও বাচাও* শব্দ ম্লান হয়ে গেছে।

ইজ্জত হারানোর আগেই ঝড় থেমে যায়।

সবাই স্বাভাবিকভাবে চলাচল শুরু করে।

স্বামী দরজায় টোকা দিল। বুকের কাপড় গুছিয়ে বন্ধুটির গায়ে একটা চড় মেরে দরজা খুলে বের হলাম।

স্বামী বললো, তুমি ভালো আছো তো? আমি তো এতোক্ষণ সিড়ি থেকে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে ছিলাম। তুমি খুব ভয় পেয়েছিলে তাই না। আমার বন্ধুটির বেশ সাহস। সে একটুও ঘাবড়ায় না।

স্বামীর কপালে লেগে থাকা দুই ফোটা রক্ত মুছে দিলাম শাড়ির আচল দিয়ে।

বললাম, হ্যা, আমি ভালো আছি। তোমার বন্ধুর সাহসের প্রশংসা করতে হয়। তবে এতো সাহস ভালো নয়।

বাইরের বৃষ্টি থেমে গেলেও আমার চোখের আকাশ দিয়ে বৃষ্টি ঝরেই চলছে। আমার মনের ভেতর বয়ে যাচ্ছে এখনো বজ্রপাত, বাতাসের তীব্রতা ও ঝড়।

এখনো স্বামীকে নিয়ে বাবার বাড়ি যাই। লঞ্চে চড়েই যাই। তবে দুজন একত্রে থাকি যতোই ঝড়–তুফান হোক। এড়িয়ে চলি সাহসীদেরকে। ধন্যবাদ দিই উপরওয়ালাকে যার ইশারায় সেদিন ঝড় থেমেছিল এবং আমার ইজ্জত রক্ষা হয়েছিল।

জিয়া মার্কেট, ভোলা থেকে

জ্যোৎস্নায় এক নারী

– শিমুল শিকদার

বর্ষাকালে জ্যোৎস্না রাতে নৌকায় ঘুরে বেড়ানোর মজাই আলাদা। তাই বন্ধুরা মিলে সিদ্ধান্ত নিলাম নৌকায় যে কোনো জ্যোৎস্না রাতে সারা রাত ঘুরে বেড়াবো।

আমাদের গ্রামের শেষ প্রান্তে বিশাল একটি বিল আছে। যেখানে শুকনো মরসুমে ধান চাষ হয় আর বর্ষাকালে জোয়ারের পানিতে বিলটি সম্পূর্ণ ভরে যায়। এ সময় বিলটিকে দেখতে অনেকটা সমুদ্রের মতো লাগে। সারা রাত নৌকায় আড্ডা দেবো। তাই সঙ্গে কিছু খাবার নিতে ভুল করলাম না। কোক, বিস্কিট, সিগারেট, পানি ইত্যাদি।

আকাশে পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না ভরা একটি চাদ। চাদটি তার জ্যোৎস্না পৃথিবীকে বিলিয়ে দিচ্ছে অকৃপণভাবে। ঝিরি ঝিরি বাতাসে পানিতে ছোট ছোট ঢেউ। চারপাশের গ্রামের পাড়াগুলোকে মনে হচ্ছে এক একটি দ্বীপ। আবার গ্রামের কোনো ডানপিটে ছেলে তার ঘুড্ডিকে আকাশে উড়িয়ে দিয়েছে রাতের জ্যোৎস্না ভরা চাদকে ছোয়ার জন্য। সব মিলিয়ে সে এক চমৎকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করছি সবাই মিলে।

এরই মধ্যে আমাদের নৌকার মাঝি ছেলেটি আমাকে উদ্দেশ্য করে বললো, ভাইজান, কে যেন কানতাছে।

বললাম, কোথায়?

ওই যে শুনুন।

হ্যা সত্যি, আমাদের নৌকা থেকে দুইশ গজ দূরে একটি নৌকার মধ্যে কয়েকটি লোক দেখা যাচ্ছে। কান্নার শব্দটি ওই নৌকা থেকেই আসছে। তাও আবার নারীর কণ্ঠ। কান্নাটি খুব করুণ। মনে হয় কেউ তাকে আঘাত করছে। আমাদের আড্ডাটি এতো জমে গেছে যে, কারো কোনো দিকে খেয়াল নেই।

আমি সবাইকে ব্যাপারটি বলার পর সবাই খেয়াল করলো। সত্যি তো কান্নার শব্দ! চল সবাই যাই। এরই মধ্যে এক বন্ধু বললো।

আমরা বুদ্ধি করে আমাদের নৌকার মাঝি ছেলেটিকে দিয়ে প্রথমে ওই নৌকার উদ্দেশ্যে ডাক দেয়ালাম।

মাঝি ছেলেটি দুই তিনবার ডাক দেয়ার পর হঠাৎ পানিতে লাফিয়ে পড়ার শব্দ। লোকগুলো পালিয়ে চলে যাচ্ছে। এরই মধ্যে আমাদের নৌকাটি ওই নৌকার কাছে চলে এসেছে।

আমি আর আমার এক বন্ধু ওই নৌকার মধ্যে গেলাম। আমার বন্ধুটি ওই নৌকার মাঝি ছেলেটিকে চড়–থাপ্পড় মারতে শুরু করলো।

আমি মেয়েটির কাছে গেলাম। সম্ভবত মেয়েটি সম্পূর্ণ উলঙ্গ ছিল। কাপড় পরার সময় না পেয়ে পড়ে থাকা কাপড়গুলো দিয়ে কোনো রকমে তার বক্ষটি এবং নিচের অংশ ঢেকে ভয়ে জড়সড়ো হয়ে বসে আছে। জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট বুঝতে পারলাম মেয়েটির পা বেয়ে রক্ত ঝরছে।

মেয়েটিকে অভয় দিলাম এবং তাকে কাপড় পরার সুযোগ দিয়ে মাঝি ছেলেটির দিকে এগিয়ে গেলাম।

কড়া স্বরে তাকে প্রশ্ন করলাম, তোমার নাম কি?

বাহাদুর...। আমার কোনো দোষ নেই। উত্তর পাড়ার রফিক আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে।

এরই মধ্যে এক বন্ধু বলে উঠলো, ও উত্তর পাড়ার রফিক গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে চাকরি করে?

মাঝি ছেলেটি ভীত স্বরে উত্তর করলো, হ্যা।

ওই নৌকাটির মধ্যে সিগারেট, গাজা, বাংলা মদের পলিথিন ব্যাগ। ছেলেগুলো পালানোর সময় কেউ কেউ তাদের কাপড় রেখে চলে গেছে।

এমন একটি ঘটনার জন্য আমরা কেউ প্রস্তুত ছিলাম না। তখনো ভেবে পাচ্ছিলাম না কি করবো। এতো রাতে একটি মেয়েকে নিয়ে আমরা এতোগুলো যুবক!

সবাই পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিলাম আগে নৌকা পাড়ে ভিড়াই, তারপর ভেবে দেখা যাবে।

আমি, আমার এক বন্ধু মেয়েটি যে নৌকায় সেই নৌকায় রইলাম। বাকি বন্ধুরা আমাদের নৌকায়। তখনো মেয়েটি ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে আছে।

আমি মেয়েটির পাশে গিয়ে বসলাম। তোমার নাম কি?

মেয়েটি কোনো উত্তর দিল না। জ্যোৎস্না ভরা পানির দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। আবার বলার পর মেয়েটি আমার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে কি যেন খুজতে চাইলো। তারপর ক্ষীণ কণ্ঠে বললো, দিলরুবা।

মেয়েটির বাড়ি ময়মনসিংহ জেলায়। মেয়েটির মা নেই। বৃদ্ধ বাবা আর ছোট দুটি ভাইবোন আছে। পেটের জ্বালা মেটাতে আমাদের থানায় আসে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে চাকরি করতে। বেতন এক হাজার দুইশ টাকা। ফ্যাক্টরিতেই পরিচয় হয় রফিকের সঙ্গে। রফিক প্রথম অবস্থায় মেয়েটিকে টাকা দিয়ে সাহায্য করতো। এছাড়া মেয়েটির অন্যান্য সুবিধা-অসুবিধাগুলো রফিক দেখতো। এভাবেই রফিকের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা হয়। তারপর রফিক তাকে রঙিন স্বপ্ন দেখায়। ঘর বাধার স্বপ্ন। বাঙালি সব মেয়েরাই ঘর বাধতে চায়। দিলরুবাও চেয়েছিল। তাই সেই স্বপ্ন নিয়ে সে রফিকের সঙ্গে এসেছিল নৌকায় করে জ্যোৎস্না দেখতে। কিন্তু রফিক কিছু নরপশুকে সঙ্গে নিয়ে দিলরুবার ঘর বাধার স্বপ্নকে চিরতরে ভেঙে দিল।

নিজের চোখে সেদিন দিলরুবাকে দেখে বুঝতে পেরেছিলাম, আমাদের এই দেশের মেয়েরা কতো অসহায়। বিশেষ করে যারা দূরদূরান্ত থেকে আসে বিভিন্ন গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে চাকরি করতে। তারাও তো এ দেশেরই কোনো মা-বাবার সন্তান, কোনো ভাইয়ের বোন। তারাও দেশের উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েদের মতো সম্মান নিয়ে বেচে থাকার অধিকার রাখে!

আমরা মেয়েটিকে আমাদের বন্ধুর এক খামার বাড়িতে নিয়ে গেলাম। সেখানে তার গোসল এবং খাওয়ার ব্যবস্থা করলাম।

সেদিন আমার বন্ধুদের কেউ কেউ বলছিল, মেয়েটি কি সত্যি নিশিকন্যা, না ভালো মেয়ে?

বন্ধুদের বললাম, মেয়েটি খারাপ কিংবা ভালো এ মুহূর্তে জানি না। তবে মেয়েটি যে বিপদে পড়েছে সে কথা সত্যি। তাই আমাদের উচিত তাকে সম্মান করা।

তারপর মেয়েটিকে একটা পরিচিত রিকশায় উঠিয়ে দিলাম এবং তার হাতে কিছু টাকা দিতেই সে তা নিতে চাইলো না।

তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, ধরো, আমি তোমার বড়ভাই। ভাই তো তার বোনকে টাকা দিতেই পারে।

আমার কথা শুনে মেয়েটি কাদতে শুরু করলো।

এরপর সব বন্ধুরা একে একে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বিদায় দিল।

কালিয়াকৈর, গাজীপুর থেকে

মতিলাল

– মোহাম্মদ মাহমুদুল হক

মতিলাল হাজরার সঙ্গে আমার দেখা হয় বরিশালের বাবুগঞ্জে। তিনি অতি সৌভাগ্যবান একজন যিনি এক নৌ দুর্ঘটনায় বেচে যান। তিনি দুর্ঘটনার বর্ণনা করেন এভাবে :

হঠাৎ করে ঝড়ে লঞ্চটি কাত হয়ে পড়লে আমার ঘুম ভেঙে যায়। আমি জানি না কিভাবে লঞ্চ থেকে বের হই। অজ্ঞান এবং অচেতন অবস্থায় নৌবাহিনীর ডুবুরিরা একদিন পরে আমাকে উদ্ধার করে।

বেচে থাকার আনন্দে তিনি বিভোর হননি। কেননা জ্ঞান ফেরার পর বুঝতে পারেন তার মা আর ছোট ভাই চিরদিনের মতো হারিয়ে গেছে।

মতিলাল মাছের ব্যবসা করতেন। বর্তমানে তিনি ফেরি করে শাক-পাতা বিক্রি করেন। চিরদিনের মতো ছেড়ে দিয়েছেন মাছের ব্যবসা।

এই দুর্ঘটনার কথা তিনি কারো কাছে বলতেও বড় অস্বস্তি বোধ করেন। তার মতো হাসিখুশি লোক এখন অনেকটা কঠিন মনের মানুষে রূপ নিয়েছে। তার কথা আজকাল অস্পষ্ট আর চিন্তা ধারায় অসংলগ্নতা দেখা দিয়েছে। তবে মানবিকতা কৃতজ্ঞতা বোধ পুরোপুরি বিদ্যমান। মা কালীর আশীর্বাদ ছাড়া তার পক্ষে বাচা অসম্ভব ছিল এই কথা বলতে তিনি ভোলেন না। বড় গভীর সেই আবেগের রেশ। যার সমাপ্তি মেলে অশ্রুতে।

আবেগ সহ্য করতে পারি না। দ্রুত মতিলালের কাছ থেকে বিদায় নিই।

মিরপুর, ঢাকা থেকে

মৎস্যকন্যা

– রতন কির্তনীয়া

১৯৬৮ সালের জুলাইয়ের শেষের দিকের ঘটনা। আমার গ্রামের বাড়ি গোপালগঞ্জ জেলা শহর থেকে পনেরো মাইল উত্তর দিকে অবস্থিত। মাদারীপুর বিলরুট কানালের কাছেই। এখানকার মাছ তখন পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে বিখ্যাত। প্রচুর পরিমাণে মাছ পাওয়া যেতো। কেউ মাছ কিনে খেতো না। ছোট মাছ যেমন পাওয়া যেতো তেমনি দশ বারো সের ওজনের বোয়াল, রুই, কাতল, আইড় যত্রতত্র পাওয়া যেতো।

আমাদের বাড়ির কাছেই চান্দা বিল। চান্দা বিলেই মাছ বেশি পাওয়া যেতো। আমাদের বাড়ি চান্দা বিলের পূর্বদিকে অবস্থিত। চান্দা বিল পূর্ব-পশ্চিমে কমপক্ষে পাচ মাইল বিস্তৃত।

আমার মামাতো ভাইয়ের বিয়ে। বিয়ে পরিবারের অমতেই হবে। বড়লোক মামার একমাত্র ছেলের বিয়ে। বিয়েতে অমত থাকলেও সামাজিকতার কারণে কনে দেখা, আশীর্বাদ ইত্যাদি করতে হয়েছে। মেয়ের বাড়ি চান্দা বিলের পশ্চিমে এক গ্রামে।

মামা, কাকা, ভাইবোন, আত্মীয়স্বজন মিলে আমরা এগারোজন মেয়ের বাড়িতে সকালেই নৌকায় রওনা হবো বলে আগের দিন সিদ্ধান্ত হলো। কনে দেখতে গেলে কিছু উপহার সামগ্রী যেমন শাড়ি, কিছু গহনা, মাছ নিয়ে যেতে হয়। যেহেতু বিয়ে হবেই, তাই মাছ অতি অবশ্যই নিতে হবে।

যাত্রার দিন ভোরেই মামা বলে বসলেন, আমি যেতে পারি কিন্তু কিছু নিয়ে যাবো না। শাড়ি, গহনা, মাছ এসব যদি নিতে হয় তবে আমি যাবো না। তোমরা সবাই যেতে পারো।

আমাদের সবার সব রকমের অনুরোধ, আকুতি তিনি কিছুই রাখলেন না। এদিকে মেয়ের বাড়িতে আগেই খবর দেয়া হয়েছে যে আমরা ফাইনাল দেখা দেখতে আসছি।

মেয়ের বাড়িতেও নিশ্চয়ই খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। তারা অনেক কিছুই জোগাড় করেছে। সবচেয়ে বড় কথা, আমরা না গেলে আমাদেরকে সামাজিকভাবে খুব হেয় হতে হবে।

শেষ পর্যন্ত মামার জয় হলো। কোনো কিছু না নিয়েই সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ এগারোজন নৌকায় উঠলাম। দুইজন মাঝি।

মাদারীপুর বিলরুট কানাল পার হয়ে নৌকা চান্দা বিলের মধ্যে ঢুকেছে। দুইজন মাঝি নৌকা চালাচ্ছে। নৌকাটা কমপক্ষে দশ হাত লম্বা হবে।

আমাদের এদিকে নৌকা মাপার হাত হলো সম্পূর্ণ হাত অর্থাৎ আঠারো ইঞ্চি নয় প্রায় ছত্রিশ ইঞ্চি। নৌকায় সুন্দর এবং শক্ত ছই দেয়া।

নৌকায় উঠেই মামা নানান শক্ত কথা বলতে লাগলেন এবং তার ছেলেকে যতোটা সম্ভব খারাপ বলা যায় তা বলতে লাগলেন। মেয়ের মা বাবাসহ তাদের আত্মীয়স্বজনের সম্পর্কে বাজে মন্তব্য করতে লাগলেন।

নৌকার মধ্যে পরিবেশ খারাপ হয়ে উঠলো। আমরা কম বয়স্ক চারজন নৌকার ছৈই–এর ওপর ছাতার নিচে বসে আছি। নৌকা ধীরে ধীরে এগোচ্ছে।

নৌকার ভেতরে মামা তখনো বকাবকি করে চলছেন। এ পর্যায়ে বললেন, তিনি এ বিলের মধ্যেই ঝাপিয়ে পড়বেন।

অন্য সবাই তখন মামাকে বোঝাচ্ছেন, তুমি যদি না যেতে চাও তবে যেও না। নৌকায় বসে থেকো।

এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে মামা তেলে–বেগুনে জ্বলে উঠলেন এবং বললেন, নৌকা ফিরাও।

এ কথা বলে মামা নৌকার বাইরে আসবেন বলে কেবল প্রস্তুতি নিয়েছেন। এমন সময় ঘটলো সেই ঘটনা। দুইটা মাছ যার প্রতিটার ওজন কমপক্ষে ছয় সাত কেজি হবে, বিল থেকে লাফ দিয়ে নৌকায় মামার পায়ের কাছে পড়লো। একটা রুই এবং অন্যটা কাতল মাছ। মাছ দুটো নৌকায় উঠে খুব দাপাদাপি শুরু করলো।

মামা সব কিছু ভুলে মাছ দুটোকে এক সঙ্গে জড়িয়ে ধরলেন।

নৌকার সবাই একদম চুপ মেরে আছে। আমার চোখের সামনেই সব ঘটছে।

মামা মাঝিদের বললেন, তাড়াতাড়ি নৌকা চালাও। মেয়ের বাড়িতে রান্না হয়ে গেলে এই মাছ নিয়ে তারা বেকাদায় পড়বে।

মামা কনেবাড়ি গিয়ে যে আচরণ করলেন তা না লেখাই ভালো। মেয়েকে কয়েকশবার মা বলে ডাকলেন। মেয়ের মা বাবাকে দিদি–দাদা বলে বিয়ের দিন ঠিক করে এলেন।

তারপর বহুদিন পর্যন্ত, বহু বছর পর্যন্ত আমরা সেই বৌদিকে *মৎস্যকন্যা* বলে ডাকতাম।

সাতপাড়, গোপালগঞ্জ থেকে

আরেক টাইটানিক

– অর্পিতা

আমার বাবা নৌ বাহিনীর অফিসার। বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর বেশ কয়েকটি বড় জাহাজে দায়িত্বে ছিলেন। এছাড়া মংলা সমুদ্র বন্দরে *এলসিটি* জাহাজের প্রধান হিসেবে দীর্ঘ দিন দায়িত্ব পালন করেছেন। সেই সুবাদে জাহাজ এবং সমুদ্রকে ঘিরে বাবার রয়েছে বিশাল অভিজ্ঞতা।

নৌ বাহিনীর বাণী হচ্ছে, *শান্তিতে সংগ্রামে সমুদ্রে দুর্জয়।*

নৌ বাহিনীতে চাকরিরত সবাই এ বাণীতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

মেরিন ইঞ্জিনিয়ার পেশায় যারা কর্মরত তাদেরও জাহাজেই কাটাতে হয় অধিকাংশ সময়। তাদের কর্মক্ষেত্র সমগ্র পৃথিবী জুড়ে বিস্তৃত। এবার আসি মূল ঘটনায়।

ঘটনাটি ঘটেছিল মংলা সমুদ্র বন্দরের অদূরে। সেখানে সমুদ্র পরিদর্শনে গিয়েছিল নৌ বাহিনীর একটি জাহাজ। জাহাজের অফিসার ইনচার্জ ছিলেন আমার বাবা এবং একজন সিনিয়র অফিসার। মংলা সীমান্ত পেরিয়ে জাহাজ অনেক দূরে গিয়েছিল। জাহাজকে আরো সামনে যাবার জন্য ওই অফিসারটি নির্দেশ দিলেন। কিন্তু আমার বাবা নিষেধ করেছিলেন। কারণ সেখানে জাহাজ চালানো খুব বিপজ্জনক। সমুদ্রের সেই অংশে পানির নিচে অনেক পাথর।

কিন্তু সিনিয়র একজন অফিসারের কথা সবাইকে শুনতে হবে। তাই জাহাজ ওই পথেই চলতে থাকলো।

জাহাজ চলছে তার আপন গতিতে এবং যে যার কাজে ব্যস্ত। হঠাৎ করে জাহাজে একটা ভারী কম্পন হলো। প্রথমে কেউ কিছু বুঝতে পারলো না। তারও অনেকক্ষণ পর জাহাজের একজন নাবিক ইঞ্জিনরুমে পানি দেখতে পেল। সে এসে বাবা এবং অন্য অফিসারকে জানাতেই সবাই ছুটে গেল ইঞ্জিনরুমে। তারপর সাবই

কারণ আবিষ্কার করলো, জাহাজটি একটি বিরাট পাথর খণ্ডের সঙ্গে বাড়ি খেয়েছে এবং জাহাজের তলদেশ ফুটো হয়ে গিয়েছে।

সর্বনাশ! যা হবার তা হয়ে গেছে। জাহাজে ফুটো দিয়ে অনবরত পানি ঢুকতে লাগলো। এবার তো সবার দিশেহারা অবস্থা। তখন সবাই মৃত্যু ভয়ে শংকিত। সেই অবস্থা না দেখলে হয়তো বোঝা যাবে না।

জাহাজের বিপদ সংকেত বাজিয়ে দেয়া হলো। বাবার ভাষ্য মতে, সবাই তখন দিকবিদিক জ্ঞান শূন্য। প্রাণ রক্ষার জন্য সবাই সর্বত্র ব্যবস্থা নিতে লাগলো। টাইটানিক ডোবার প্রাক্কালের অবস্থা হয়েছিল এই জাহাজটিতেও। তবে এই জাহাজে এতো মানুষ ছিল না।

জাহাজটিতে পানির পরিমাণ বাড়তে লাগলো। জাহাজের ইঞ্জিনরুম তখন সম্পূর্ণরূপে পানির নিচে। অদূরে হঠাৎ করে আরেকটি জাহাজ দেখতে পেয়ে বাবাসহ অন্য সবার তখন অন্তরে পানি এসেছিল। জাহাজটি কাছ আসতেই দেখা গেল জাহাজে একদল আর্মি। তারা নাকি একটি কাজে অপর সীমান্ত দিয়ে যাচ্ছিল। এবং বিপদ সংকেত শুনতে পেয়ে এগিয়ে এসেছে।

খুব দ্রুত এই জাহাজ থেকে অপর জাহাজে একটি কাঠ বিছিয়ে দিয়ে জাহাজের সবাই পার হলো। এরপর জাহাজটি আস্তে সম্পূর্ণ পানির নিচে ডুবে গেল। বিনষ্ট হলো নৌবাহিনীর কোটি টাকার সম্পত্তি। তবে সেদিন সবাই প্রাণে বেচে গিয়েছিল।

এই ঘটনার পর অনেক তদন্ত হয়েছে। এতে করে ওই সিনিয়র অফিসারকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। আমার বাবার কিছুই হয়নি। কারণ আমার বাবা নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছিলেন।

আমার বাবার জীবনে এটিই সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা।

বাবা এখনো মাঝে মধ্যে এই কথাটি বলেন। ডিফেন্স সার্ভিসে মেয়ে নিচ্ছে। তাই বাবার স্বপ্ন আমাকে একজন নৌ বাহিনী অফিসার বানাবেন। দেখি বাবার স্বপ্ন পূরণ করতে পারি কি না।

কুমিল্লা থেকে
nahid20003@yahoo.com

সি- ওয়ার্ল্ড

– শহীদুল্লাহ পলাশ

ছোটবেলায় কোনো এক বর্ষায় ছৈওয়ালা নৌকায় করে পরিবারের সবাই মিলে নানাবাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলাম আজ থেকে প্রায় সতেরো বছর আগে। সেদিন আমার অনুসন্ধিৎসু বাল্য মনে প্রচুর দোলা দিয়েছিল সেই নৌপথ ভ্রমণ। কিন্তু তখন কি ভেবেছিলাম বড় হয়ে একদিন নৌপথ ভ্রমণকেই বেছে নেবো পেশা হিসেবে! জীবনের রুজি-রোজগারের পথ হিসেবে?

আমি একজন নৌ প্রকৌশলী। জীবিকার তাগিদেই নৌপথে ভ্রমণ করি, ছুটে চলি দেশ থেকে দেশান্তরে, অজানা সমুদ্র বন্দরে। পাচ বছর চাকরি জীবনে এ নৌপথ বাড়ি দিয়েই পরিচিত হয়েছি নানান দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, মানুষ, সমাজ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে।

সর্বপ্রথম পাড়ি দিয়েছিলাম *বাংলার মুখ* জাহাজ নিয়ে পশ্চিম আফ্রকার আইভরি কোস্টের উদ্দেশ্যে। ক্যাডেট ইঞ্জিনিয়ার পদে ছিলাম। পাট রফতানির জন্য মংলা বন্দর থেকে রওনা দিয়েছিলাম দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রার উদ্দেশ্যে। টানা এক মাস ধরে জাহাজ চললো। সমুদ্রের পানি যে এতোটা নীল আর পরিষ্কার হতে পারে তা আমার ধারণার বাইরে ছিল। কারণ আগে শুধু পতেঙ্গা ও কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের ঘোলা পানির সঙ্গেই পরিচিত ছিলাম।

জাহাজের একেবারে সামনের স্ট্রাকচারকে ফোরকাসল (Forecastle) বা সংক্ষেপে ফোকসেল (Focsle) বলা হয় এবং সেই ফোকসেলের পানি সংলগ্ন আংশিক নিমজ্জিত কন্দাকৃতির অংশটিকে বালবাস বো (Bulbous bow) বলা হয়। সাগরের এই নীল জলরাশিকে বালবাস বো দুই ভাগে ভাগ করে চলছে এবং বিভক্ত অংশে গর্জনের মতো শব্দ করে প্রচুর শাদা ফেনা তৈরি হয়ে জাহাজের দুই পাশের দিক থেকে পেছনে সরে যাচ্ছে। এ সুন্দর দৃশ্য দেখলেই মন উদাস হয়ে যেতো। আর মনে হতো আমার যদি একজন... থাকতো এবং এই মুহূর্তে সে যদি আমার পাশে থাকতো!

প্রায় দিনই পড়ন্ত বিকেলে জাহাজের ফোকসেলে গিয়ে ব্যাচমেট বাদলসহ গল্প করে প্রচুর সময় কাটিয়ে দিতাম। সূর্যটাকে দেখতাম সমুদ্র থেকে উদিত হতে আবার গোধূলিলগ্নে সমুদ্রের বুকেই অস্ত যেতে। মাঝে মধ্যে ডলফিনের দেখা যেতো জাহাজের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে চলতে। এক সময় পিছিয়ে পড়ে অদৃশ্য হয়ে যেতে। আবার হালকা বৃষ্টির দিনে দেখতাম একঝাক ছোট ছোট ফ্লাইং ফিশ পানির এক হাত উপর দিয়ে উড়ে চলে কিছুক্ষণ পর পানিতে অদৃশ্য হয়ে যেতো।

এভাবে প্রতিনিয়ত সমুদ্র সৌন্দর্য উপভোগ, ইঞ্জিনরুমে সময় মতো ডিউটি পালন, রিকৃয়েশন রুমে ইনডোর গেমস ও আড্ডা দিয়ে সময় কাটছিল। কিন্তু জাহাজ বিষুবরেখা অতিক্রম করার সময় আমি এবং আমার ব্যাচমেট দুজনকেই মাথা ন্যাড়া করতে হলো। জুনিয়র ক্যাডেট এবং প্রথম সমুদ্র যাত্রা বিধায় সমুদ্র দেবতার সন্তুষ্টির জন্যই নাকি এই বিসর্জন দেয়া।

এ উপলক্ষে বেশ বড় মাপের পার্টির আয়োজন হয়। সকল অফিসার এবং চিফ ইঞ্জিনিয়ার, ভাবীসহ উক্ত পার্টিতে উপস্থিত থেকে মজা করলেন। উল্লেখ্য, জাহাজে চারজন সিনিয়র অফিসার (ক্যাপ্টেন, চিফ ইঞ্জিনিয়ার, সেকেন্ড ইঞ্জিনিয়ার ও চিফ অফিসার) নিজ নিজ ফ্যামিলিসহ ইচ্ছা করলে সেইল করতে পারেন। কিন্তু এই ভয়েজটিতে শুধু চিফ ইঞ্জিনিয়ার তার ফ্যামিলিসহ ছিলেন।

জাহাজ যখন সাউথ আফৃকার পাশ দিয়ে নির্দিষ্ট রুটে চলছিল তখন প্রচণ্ড রকম খারাপ আবহাওয়ার সম্মুখীন হলাম। জাহাজ ত্রিশ ডিগ্রির উপরে দোল খেয়ে চলতে লাগলো। অফিসার, ক্রু সকলের অবস্থাই খারাপ। কিন্তু এ পরিস্থিতির মধ্যেও সবাইকে নিজ নিজ কর্তব্য পালন করে জাহাজকে চলমান রাখতে হচ্ছে। ইঞ্জিনরুম থেকে ডিউটি শেষে ক্যাবিনে এসে দেখি জিনিসপত্র সব ফ্লোরে গড়াগড়ি খাচ্ছে। বাদল তো ক্রমাগত বমি করেই চললো। প্রায় দুদিন ধরে এই তাণ্ডব চলার পর ভালো আবহাওয়া পেতে শুরু করলাম। আবার সেই নীল সমুদ্র, নীল আকাশ, ফুরফুরে সামুদ্রিক পবন আর উচ্ছল ঊর্মিমালা।

এভাবে দীর্ঘ এক মাস পর অবশেষে আইভরি কোস্টের আবিদজান বন্দরে জাহাজ নোঙ্গর করলো। এই বন্দরে ঊনিশ দিন ছিলাম। আফৃকান কালচারের সঙ্গে পরিচিত হলাম, নানা রকম শপিং ও ঘোরাফেরায় সময় কাটলাম। পরবর্তীকালে আটলান্টিক (দক্ষিণ থেকে উত্তরে) পাড়ি দিয়ে টিউনিশিয়ায় ভিড়লাম। টিউনিশিয়া থেকে দেশের জন্য টিএসপি সার নিয়ে চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। মাঝপথে তিন দিন জাহাজের রিপেয়ার কাজের জন্য টার্কির পোর্ট সুয়েজে অবস্থান করলাম। এর মধ্যে স্থানীয় এজেন্ট আমাদের জন্য পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের অন্যতম বিস্ময় পিরামিড দেখার সুব্যবস্থা করলো। অবশেষে সুয়েজ খাল, লোহিত সাগর ও ভারত মহাসাগর হয়ে চট্টগ্রাম বন্দরে পৌছালাম। প্রায় সাড়ে তিন মাস পর পরিবারের স্বজনদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো।

পরবর্তীকালে এভাবেই সমুদ্রচারী হয়ে চাকরি জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পরলাম। সমুদ্রও তার নানান আচরণের মাধ্যমে যেমন আতংকগ্রস্ত করতো তেমনি মোহিত করে তুলতো বার বার। অতিকায় প্রাণী তিমি দেখেছিলাম শ্রীলংকার মান্নার উপসাগরে, পানির উপরিভাগে মুখ ভাসিয়ে ফুস করে উপরের দিকে বাতাস ছুড়ছে আর পরক্ষণেই ডিগবাজির মতো ডুবে যাওয়ার সময় লেজের অংশ দেখিয়ে যাচ্ছে। ভাসমান হাঙ্গর দেখেছিলাম

এডেন উপসাগরীয় অঞ্চলে, বিশাল এলবাট্রস (Albatross) না দেখলেও সি–গাল (Sea-gull)-দের দেখি প্রতিনিয়ত জাহাজের পাশ ঘেষে উড়ে যেতে দূরান্তের পানে।

চন্দ্রিমা রাতে সমুদ্র শোভা নিঃসন্দেহে অতুলনীয়। কিন্তু ঘোর অমাবস্যা রাতেও সমুদ্রের অরূপ বিস্ময় দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। একবার *বাংলার কল্লোল* জাহাজ নিয়ে সাউথ আফ্রিকার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। মধ্য রাতের সময় দেখা গেল ছোট ছোট ঢেউগুলো যেন রেডিয়ামের মতো আলো ছড়াচ্ছে। বালবাসবো–কে মনে হচ্ছে উচ্ছল আলোকিত কোনো তরল পদার্থকে দুই ভাগ করে চলেছে। সমুদ্রের এই আলোকিত রূপ কোনোদিন দেখিনি। যারা জাগ্রত ছিলেন, সকলেই ব্যাপারটিতে সমপরিমাণ অবাক হলেন। এই মায়াবী দৃশ্যটির স্মৃতি হয়তো কোনোদিন ভুলতে পারবো না। পরবর্তীকালে জানতে পারলাম, এটি কিছু Marine growth এবং Sea water-এর মধ্যকার বায়োকেমিকাল অ্যাকশনের এফেক্ট। কেউ কেউ এটিকে পানির ওপর ফসফরাসের রিঅ্যাকশন বলেও মনে করেন।

দীর্ঘ দিন সমুদ্রচারী হয়ে দেশের মাটিতে আসার পর অনেক অজানা সংবাদ পাই। দুসংবাদের পাশাপাশি সুসংবাদও পাই। আবার অনেক আফসোসের গ্লানিও বইতে হয়। এতোসব কিছুর পরও আমরা জাহাজিরা আবার নিজেদেরকে ঠেলে দিই আরেক সমুদ্র যাত্রার উদ্দেশ্যে। জীবন বোধে আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় বন্দর থেকে বন্দরে। আমরাও জীবনে চাওয়া–পাওয়ার হিসাব মেলাতে সাগর পানে ধাবিত হই এক বুক আশা নিয়ে। কিন্তু পরক্ষণে নিজের অজান্তেই সুর তুলি – *ওরে নীল দরিয়া, আমায় দে রে দে ছাড়িয়া।*

সি–ওয়ার্ল্ডের ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতায় প্রাকৃতির সৌন্দর্যের দিক থেকে ভালো লেগেছিল মরিশাস দ্বীপটিকে আর উন্নত প্রযুক্তির সৌন্দর্যমণ্ডিত দেশ দেখেছিলাম সিংগাপুরকে। অস্বস্তিকর আবদ্ধ পরিবেশ পেয়েছিলাম পোর্ট সুদান ও ইনডিয়ার গুজরাটের কয়েকটি ছোট ছোট বন্দরে। এসব এলাকায় শোর লিভ ছিল না। তিক্ত বিড়ম্বনার সম্মুখীন হয়েছিলাম ব্রাজিলের সান্তোস বন্দরে যখন সন্ত্রাসীদের কবলে পড়ে সত্তর ডলার গচ্চা দিতে হয়েছিল, যদিও অক্ষত ছিলাম।

আমাদের দেশেও এসব সন্ত্রাসীদের সংখ্যা প্রচুর। বিশেষ করে চট্টগ্রাম বহির্নোঙ্গরে বিদেশি পতাকাবাহী জাহাজগুলোকে সর্বদা জনদস্যুদের আতংকে তটস্থ থাকতে হয়। এতে করে আন্তর্জাতিকভাবে মেরিন ফিল্ডে আমাদের দেশের মান ক্ষুণ্ন হচ্ছে। আশা করি চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ও বাংলাদেশ নৌবাহিনী এই ব্যাপারটিতে তাদের সচেতনতা আরো বাড়াবে।

চট্টগ্রাম থেকে
palash3379@yahoo.com

দানিয়ুবের তীরে

– মোহসীন ভুঞা

ছেলেবেলায় ইতিহাসে পড়া দানিয়ুব নদী অস্ট্রিয়ায় এসে ডোনাও নাম নিয়েছে। প্রস্থে বাংলাদেশের যে কোনো শাখা নদীর সমান হলেও পুরো দেশের মধ্য দিয়ে গিয়ে অপূর্ব এক সুষমা দিয়েছে। খরস্রোত নেই, পাড় ভাঙা ঢেউ নেই। তবুও পাথর বিছিয়ে তীর সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ডোনাওকে নিয়ে গর্বের শেষ নেই এ দেশবাসীর। পৃথিবীর অন্যতম সুপেয় পানি উৎপাদনকারী দেশ অস্ট্রিয়া। এখানে পানি সাপ্লাই করা হয় বিনা পয়সায়। অথচ নদীমাতৃক দেশ হয়ে সুপেয় পানির অভাব বাংলাদেশে সর্বত্র। বর্ষা মরসুমে পানি হয়ে দাড়ায় জীবন বিনাশকারী। পানিপথে যাত্রা হয় মৃত্যুপথে যাত্রার অনুরূপ।

ভিয়েনার নিঃসঙ্গ সময়ের অনেকখানি কেটেছে ডোনাও পাড়ের পাথরের ওপর বসে নদীর ছলাৎ ছলাৎ শব্দ শুনে। আনমনে হারিয়ে গেছি আলমমামা আর সাদেকমামার সঙ্গে নৌকা চড়ে পানকৌড়ি শিকারে।

বেশ কিছু দিন অপর পাড়ে দুটো জাহাজ পাশাপাশি ভিড়ে থাকায় কৌতূহলী হয়ে জেনেছি এটা একটা স্কুল। কি চমৎকার নির্বাচন। এর সঙ্গে দেখেছি গ্রীষ্মের শুরুতে আমাদের দেশের লঞ্চ সদৃশ্য ভ্রাম্যমাণ জলজ রেস্টুরেন্ট। খাবারের দাম একটু চড়া হলেও নৌ ভ্রমণে পুষিয়ে দেয়া হয়। অতিথিদের ভিয়েনার কিছু মনোরম জায়গা পরিদর্শনের সুযোগ থাকে। এ সময় টুরিস্টদের সমাগম বেশি হয়।

যেদিন এ রকম একটা নৌ বিহারের পরিকল্পনা করে জাহাজে উঠি সেদিন অপ্রত্যাশিতভাবে একটা বিয়ের অনুষ্ঠানের আগাম বুকিং ছিল আমাকে যে টিকেট দিয়েছিল তার অজান্তে। আমাকে বলা হলো, যদি আমি অস্বস্তি অনুভব করি তাহলে পরবর্তী সপ্তাহে ভ্রমণ করতে পারি।

এক ঢিলে দুই পাখি মারার সুযোগ হাতে এসে যায়। কফি পানের পর হাততালি, চিৎকার ও গানের তালে জাহাজ নোঙ্গর ওঠালো। বর ও কনের পানির নিচে ডুবুরির পোশাকে বিয়ে করার দৃশ্য দেখেছি। এতে নতুনত্ব থাকলেও উপভোগ্য মনে হয়নি। ডেকে ধবধবে শাদা পোশাক আর মুক্তোর অলংকার পরিহিতা কনেকে দেখে মনে হয়েছে অপ্সরী দেখছি। জানি না, কোন বিধানে আমাদের দেশে বিধবাদের পোশাক শাদা করা হয়েছে! লাল বেনারসিতে দেশীয় কনেদের অপরূপা লাগলেও শুভ্র শাদা বেনারসিতে তাদেরকে অপ্সরীদের চেয়েও রূপসী লাগবে এতে কোনো দ্বিধা নেই।

পুরোহিত বিয়ের অনুষ্ঠানাদি শেষ করার পর কনে তার হাতে থাকা অসংখ্য শাদা গোলাপের সমন্বয়ে গড়া তোড়া ছুড়ে দেয় নদীতে। আমার মতো অনেককে অবাক করে দিয়ে অতি সংগোপনে জাহাজের কোল ঘেষে ভিড়ে একটা স্পিডবোট। বর পাজা কোলে করে কনেকে বোটে তোলে। তারপর উল্লাস ধ্বনিতে অতি দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যায় বহুদূরে। শুধু পেছনে পড়ে থাকে হঠাৎ সৃষ্ট ঢেউ।

আমি তখন স্মৃতির পৃষ্ঠা উল্টিয়ে চলে গেছি আরো পেছনে। লঞ্চে নানাবাড়ি যাচ্ছিলাম। এক স্টেশনের এসে পলি জমার কারণে লঞ্চ ঘাটে না ভিড়ে কিছুটা দূরে নোঙ্গর ফেলে। পাড় থেকে বেশ কিছু নৌকা লঞ্চের কাছে ছুটে আসে যাত্রীর খোজে। চোখ পড়ে সদ্য মেহেদি লাগানো আর অলংকার বেষ্টিত লাজুক ভঙ্গিতে দাড়িয়ে থাক এক নবপরিণীতার দিকে। তার হলদেটে শাড়ির সঙ্গে গায়ের রঙ মিশে একাকার। তীরে দাড়িয়ে থাকা প্রিয়জনরা হাত নেড়ে উল্লাস করছে।

অসহায় স্বামী বেচারা নৌকার ছইয়ে দাড়িয়ে করুণভাবে হাত ধরার অনুরোধ করছে।

কিন্তু ভয়ে জবুথবু কনে ক্ষীণ স্বরে কাতর হয়ে জানাচ্ছিল, না আমি পারবো না।

সবশেষে বর এসে বীরবিক্রমে কোলে তুলে নৌকায় উঠিয়ে নেয় আর চারদিকে শুরু হয় হাততালি। মনে হচ্ছিল, আমরা দাড়িয়ে আছি কোনো এক দ্বীপে, সেখানে রাজকুমার পঙ্খিরাজে এসে রাজকুমারীকে নিয়ে যাচ্ছে।

মেঘনা নদীতে বিশ বছর আগে দেখা সেই দৃশ্যের সঙ্গে যোজন যোজন দূরে ডোনাও নদীর তীরের দৃশ্যের তুলনা করতে বলা হলে আমি নিশ্চুপ থাকবো। শুধু মনে মনে বলবো, আমাদের দেশে একটি নদীর নাম চন্দনা। এমন মিষ্টি নামের নদী পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি নেই।

ভিয়েনা থেকে
mohsinbhuian@msn.com

সাজেশন

– মুহাম্মদ জাকির হোসেন

নৌপথে যাতায়াতের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে বলতে চাই, নিচের ব্যবস্থা নিলে নৌ দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব।

- লঞ্চ চলাচলের জন্য ছাড়পত্র দেয়ার আগে দেখতে হবে সেটা উপযুক্ত নকশা অনুযায়ী তৈরি করা হয়েছে কি না। বিআইডাবলিউটিএ এবং ডিপার্টমেন্ট অফ শিপিং এ দুই কর্তৃপক্ষ লঞ্চের ফিটনেস সার্টিফিকেট দেয়ার

সঙ্গে জড়িত। ফলে পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করে। পুরো প্রক্রিয়া যে কোনো একটি প্রতিষ্ঠানের অধীনে তত্ত্বাবধান করা উচিত।

● দীর্ঘ রুট ও বড় বড় নদী পার হয়ে যেতে হয় এমন পথে শুধু বড় লঞ্চগুলোকেই চলতে দেয়া উচিত। কারণ দুর্ঘটনা কবলিত সব লঞ্চই ছিল ছোট কিংবা মাঝারি আকারের। অথচ ঢাকা–বরিশাল রুটে যাতায়াতকারী বড় লঞ্চগুলো একই রুটে যাতায়াত করলেও সেগুলো দুর্ঘটনায় পতিত হয়নি। লঞ্চ ডুবলেই ঢালাওভাবে অতিরিক্ত যাত্রী বহনকে প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

কিন্তু সম্প্রতি ডুবে যাওয়া দুইটি লঞ্চের একটিও ওভারলোডেড ছিল না। সেক্ষেত্রে প্রধান কারণ ছিল ত্রুটিপূর্ণ কাঠামো। বর্ষা মরসুমে ছোট লঞ্চগুলোকে কোনোক্রমেই ঝুকিপূর্ণ পথে চলতে দেয়া উচিত নয়।

● লঞ্চগুলো যাতে দক্ষ ও ট্রেনিং প্রাপ্ত সারেং, মাস্টার দ্বারা চালিত হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। অনেক সময় দেখা যায় অদক্ষ সারেং লঞ্চ চালাচ্ছে। যাদের পুথিগত কোনো বিদ্যাই নেই, দেখে দেখে শিখেছে এমন চালকদের কারণে অনেক দুর্ঘটনা হয়।

সম্প্রতি ডুবে যাওয়া একটি লঞ্চ দুর্ঘটনায় পতিত হওয়ার সময় মূল সারেং ঘুমাচ্ছিল। লঞ্চ চালাচ্ছিল অদক্ষ একজন।

● কর্তৃপক্ষের কঠোর তদারকির মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে যেন কোনো লঞ্চে অতিরিক্ত যাত্রী বা মালামাল বহন করা না হয়।

● যাত্রীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে যাতে তারা অতিরিক্ত যাত্রী হয়ে লঞ্চে ভ্রমণ না করে। এক্ষেত্রে সরকারি প্রচার মাধ্যম ব্যাপক ভূমিকা পালন করতে পারে। যদিও রেডিও, টেলিভিশনে এ সম্পর্কে প্রচার চালানো হয় তবু তা আরো জোরদার করা উচিত।

● ঝুকিপূর্ণ ও দীর্ঘ রুটগুলোতে দিনের বেলা লঞ্চ সার্ভিস চালানো উচিত। রাতের অন্ধকারের কারণে প্রতিটি দুর্ঘটনাই ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। সামান্য কিছু সমস্যা হলেও দিনের বেলা লঞ্চ চালালে (বিশেষ করে বর্ষা মরসুমে) জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।

● প্রায় লঞ্চেই প্রাণরক্ষাকারী সরঞ্জামের সংখ্যা নিতান্তই কম। তাই প্রতিটি লঞ্চ তার ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী বয়া ও অন্যান্য সরঞ্জাম সঙ্গে রাখছে কি না সেটা নিশ্চিত করতে হবে।

● সাম্প্রতিক বড় নৌ দুর্ঘটনার বেশির ভাগই হয়েছে চাদপুরের মেঘনা–ডাকাতিয়া মিলন স্থলের ঘূর্ণাবর্তের কাছাকাছি। বর্ষা মরসুমে মেঘনা–ডাকাতিয়া নদীর মিলন স্থল খুবই ঝুকিপূর্ণ জায়গা। কিন্তু তেল খরচ কমানোর জন্য বেশির ভাগ লঞ্চই এখান দিয়ে পার হয়। ফলে দুর্ঘটনা ঘটে। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া উচিত।

● অনেক সময় দেখা যায় আবহাওয়ার সংকেত ঠিক মতো না মেনে লঞ্চগুলো চলাচল করে। এক্ষেত্রে খারাপ আবহাওয়া বা খারাপ আবহাওয়ার আশংকা থাকলে ঘাট থেকে লঞ্চ ছাড়তে দেয়া উচিত নয়। প্রতিটি লঞ্চের সঙ্গে নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষের যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা উচিত যাতে বিপদের সময় জরুরি ব্যবস্থা নেয়া যায়। তথ্য প্রযুক্তির এই যুগে এটা খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়।

সবশেষে নৌ পরিবহনমন্ত্রীর কাছে আবেদন, হাত পা গুটিয়ে বসে না থেকে বাস্তবমুখী ব্যবস্থা নিন। ইচ্ছা থাকলে হাজারো অনিয়মের এ দেশেও সফল হওয়া যায়। উদাহরণ তো আপনার সম্মুখেই। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহসানুল হক মিলন পাবলিক পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধে বৈপ্লবিক সাফল্য পেয়েছেন। তাই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিন। তা না হলে একদিন বিশ্বে এ দেশের পরিচিত হবে *নৌ দুর্ঘটনার* দেশ হিসেবে। নৌ পরিবহনমন্ত্রী হিসেবে আপনি নিশ্চয়ই তা চান না!

ঢাকা থেকে

অপারেশন ক্লিন হার্ট

– মোহাম্মদ ওয়াহীদুল ইসলাম হানিফ

২০০২ সালের বর্ষাকাল। আমাদের এক বন্ধু এমএ পাস করা উপলক্ষে একটি পার্টির আয়োজন করলো। আমাদের বন্ধুদের মধ্যে একটা গ্রুপ আছে। *চতুরঙ্গ গ্রুপ*। এখনো আমাদেরকে সবাই এ নামে চেনে। এলাকার বিভিন্ন সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ এ গ্রুপের লক্ষ্য। বিয়ের জন্য আর্থিক সমস্যা, টাকার জন্য লেখাপড়া করতে না পারা ইত্যাদির প্রতি আমরা গুরুত্ব দিয়ে থাকি। আমাদের সহায়তায় বেশ কিছু ছেলেমেয় বিনা খরচে লেখাপড়া করতে পারছে।

পার্টির তারিখ নির্ধারণ করা হলো। সিদ্ধান্ত হলো চতুরঙ্গের সদস্য ছাড়া পার্টিতে কেউ অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

বন্ধু নাজিম বললো, পার্টিটা একটু ভিন্নধর্মী হোক।

সবাই সানন্দে সায় দিল।

অনেক চিন্তা ভাবনার পর সিদ্ধান্ত হলো, রাতের বেলায় বুড়িগঙ্গার সৌন্দর্য উপভোগ করবো। সে জন্য বড় আকারের একটা ছৈওয়ালা নৌকা ভাড়া করা হলো। গান বাজনার জন্য নারায়ণগঞ্জ থেকে বায়না করা শিল্পী আনা হলো। আমাদের মধ্যে টিটু খুব ভালো তবলা বাজাতে পারে। বাশির জন্য রাখা হলো সাঈদকে। সাঈদ বাশি বাজিয়ে সবাইকে মাত করে দিতে পারে।

নির্দিষ্ট রাতে আমরা মোট চোদ্দজন বন্ধু নৌকায় উঠলাম। জ্যোৎস্না আলোকিত রাত। চারদিকে চাদের আলো ছড়িয়ে আছে। রাতের সৌন্দর্যে সবাই মুগ্ধ। বুড়িগঙ্গার ওপর নৌকা ভাসছে। শিল্পী একটার পর একটা গান গেয়ে চলেছে। সবাই গানে বিভোর। গানের তালে তালে শুরু হয়েছে নাচ। খোরশেদ চমৎকার নাচতে পারে। খোরশেদ নাচছে। আমরা হাততালি দিয়ে উৎসাহ দিচ্ছি।

রাত গড়িয়ে চলেছে। দুটা বাজে। সেদিকে কারো খেয়াল নেই। বাড়ি থেকে তৈরি করে আনা খাবার পড়ে রয়েছে, খাবার কথা কারো মনেই আসছে না। একটা গান শেষ হচ্ছে তো আমরা পাচ, দশ টাকার নোট শিল্পীর দিকে ছুড়ে মারছি। হারমোনিয়ামের ওপর প্রচুর খুচরা টাকা জমা হয়ে গেল। শিল্পী যে এতো ভালো গান গাইতে পারে তা ছিল আমাদের ধারণার বাইরে। আমরা জগৎ সংসার ভুলে গেলাম।

গানের মাঝখানে হঠাৎ একটা কণ্ঠ ভেসে এলো, হ্যান্ডস আপ। সবাই হাত তোলো।

তাকিয়ে দেখি একটা স্পিডবোট আমাদের নৌকার সামনে এসে ভিড়েছে। চারজন সৈনিক অস্ত্র উচিয়ে ধরে আছে। একজন অফিসার। সে সময় খালেদা জিয়ার সন্ত্রাস দমন অভিযান চলছিল।

আর্মি দেখে আমরা হতচকিত হয়ে গেলাম। এমন অপ্রত্যাশিত ঘটনা আশা করিনি।

স্পিডবোট নৌকার কাছে ভেড়ামাত্রই দুজন সৈনিক আমাদের নৌকায় উঠে এলো। সবাই আমরা দাড়িয়ে গেলাম শুধু শিল্পী বসে রইলো। হয়তো কি ঘটেছে বুঝতে সময় নিচ্ছিল।

একজন সৈনিক হঠাৎ দড়াম করে তার পিঠে লাথি মেরে বসলো।

লাথি খেয়ে তার মাথা গিয়ে লাগলো হারমোনিয়ামের ওপর। মাথা অনেকখানি কেটে গেল।

আমরা হতবাক হয়ে গেলাম।

অফিসারের দিকে একজন সৈনিক তাকিয়ে বললো, স্যার, নিশ্চয়ই ডাকাতি করে ফিরছে। দেখছেন না সঙ্গে হাড়ি–পাতিল রয়েছে।

সৈনিকটি বাড়ি থেকে খাবার তৈরি করে আনা পাত্রগুলোর দিকে ইঙ্গিত করলো।

আরেকজন খুচরা টাকাগুলো দেখিয়ে বললো, স্যার, নিশ্চয়ই এরা জুয়া খেলছিল। এরা বড় সন্ত্রাসী।

আমাদের আত্মারাম খাচা ছাড়া। সবাই আল্লাহকে ডাকছি। অফিসারটি ওয়ারলেসে কার সঙ্গে যেন কথা বলছে। সম্ভবত আরো ফোর্স আসতে বলছে।

সাহস সঞ্চয় করে অফিসারের দিকে এগিয়ে গেলাম।

স্যার, একটা কথা বলতে পারি।

অফিসার ভ্রূ কুঞ্চিত করে আমার দিকে তাকালেন। হয়তো বোঝার চেষ্টা করছেন আমি কতো বড় সন্ত্রাসী। তারপর ধমকের সুরে বললেন, কি বলতে চান?

আমি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে রাতের বেলা এভাবে নৌকা ভ্রমণের কারণ বর্ণনা করলাম। তাকে জানিয়ে দিলাম, আমরা এখানে যে কয়জন ছেলে আছি সবাই শিক্ষিত। কেউ কেউ কলেজ-ইউনিভার্সিটি থেকে বের হয়ে গেছি। কেউ কেউ এখনো পড়াশোনা করছি। তাছাড়া আমাদের পোশাক-পরিচ্ছদ সন্ত্রাসীর পরিচয় দেয় না।

মনে হয় অফিসারটি আমার কথা বিশ্বাস করলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে গম্ভীর গলায় বললেন, রাতের বেলা এভাবে বের হওয়া আপনাদের উচিত হয়নি। সারা দেশে আর্মি নেমেছে আপনারা জানেন না? আপনারা কেন এমন বোকামি করতে গেলেন।

আমরা স্বীকার করলাম আমাদের ভুল হয়ে গেছে।

যান তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে যান। কোথাও দেরি করবেন না। তাহলে আবার বিপদে পড়বেন।

তাকে ধন্যবাদ দিয়ে বললাম, স্যার, আমাদের এখানে একজন গায়ক আছে, খুব ভালো গান গায়। আপনার একজন সৈনিক লাথি মেরে তাকে আহত করেছে। আপনি কি দয়া করে তাকে একটু দেখবেন।

আমাদের সবাইকে অবাক করে দিয়ে অফিসার নৌকায় উঠে এলেন। গায়কের মাথায় হাত দিয়ে মমতা ভরা গলায় বললেন, যান ভাই, তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে যান। জানেন তো মাঝে মধ্যে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও আমাদেরকে অপ্রিয় কাজ করতে হয়।

সেদিন সেই অফিসারের ব্যবহার আমাদেরকে মুগ্ধ করেছিল। জানি না তিনি এখন কোথায় আছেন। তার সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করি।

কেরানিগঞ্জ, ঢাকা থেকে

শেষ খেয়া

– মামুন

ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল থানার দক্ষিণ অংশের বিল, ঝিল এবং অরণ্যরাজিতে ঘেরা লোকালয় বিহীন, নির্জন জায়গাটি *হাইরাদি* নামে পরিচিত। বসতবাড়ি বিহীন এই অংশটি এক সময় সন্ত্রাসের জনপদ হিসেবেই মানুষের কাছে পরিচিত ছিল। কারো সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ হলে লোকজন ভয় দেখিয়ে বলতো, *শালা, তোকে হাইরাদি নিয়ে যাবো*। এখন অবশ্য সে অবস্থা নেই। গড়ে উঠেছে লোকালয়, সভ্যতার ছোয়াও লেগেছে বেশ।

আমার নানার বাড়ি হাইরাদির কাছেই। তাছাড়া হাইরাদিতে নানার বিশাল আম কাঠালের বাগানও ছিল। ছোট বেলায় আমার প্রিয় জায়গা ছিল নানাবাড়ি এবং প্রিয় মানুষ ছিল নাজমাআপা। নাজমাআপা সম্পর্কে মামাতো বোন। চটপটে এবং দুরন্ত এক বালিকা। ছোট বেলায় তার পুতুল খেলা এবং কোন্দায় (তাল গাছের তৈরি নৌকা) চড়ার নিত্যসঙ্গী ছিলাম।

নানাবাড়ির পাশেই কুমুইরা নামক বিশাল বিল। বিলে ফুটে থাকতো বকের পালকের মতো শাদা শাপলা ফুল। ফুলগুলো যেন মুচকি হাসিতে আমাদের আহ্বান করতো। কোন্দায় চড়ে শাপলা ফুল তোলা ছিল আমাদের প্রতিদিনের রুটিন ওয়ার্ক।

একদিন ভরবৃষ্টিতে শাপলা ফুল কুড়াতে কুড়াতে কুমুইরা বিল থেকে বের হয়ে আচলা (পার্শ্ববর্তী বিল) বিল হয়ে কোন সময় হাইরাদির কাছাকাছি পৌছে গেছি তা আমরা কেউ বুঝতেই পারিনি। গভীর নির্জনতায় বিস্তৃত বিলে মনের আনন্দে শাপলা কুড়াতে ব্যস্ত আমরা দুই অবাধ বালক-বালিকা যেন স্বর্গোদ্যানে দুই দেব শিশু। এমন সময় দেখি আমাদের পাশেই ডিঙিতে চড়া, গামছায় মুখ বাধা চারজন লোক।

আমরা ভয়ে চিৎকার শুরু করলাম। কিন্তু আমাদের কান্না শোনার কেউ নেই।

লোকগুলো আমাদের কোন্দা থেকে নাজমাআপাকে চিলের মতো ছো মেরে তুলে নিল। আমাকে পানিতে ধাক্কা দিয়ে ফেলে, আমাদের কোন্দা পানিতে ডুবিয়ে দিল। মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেল এসব ঘটনা।

কোনো রকমে সাতরিয়ে তীরে উঠলাম। বাড়ি পৌছাতে পৌছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল।

এই খবর শোনার পর সবাই নামজাআপাকে খুজতে বেরিয়ে গেল। থানা-পুলিশও করা হলো। তিন দিন খোজাখুজির পরও কোনো হদিস মিললো না। চতুর্থ দিনে একটি পরিত্যক্ত গোয়াল ঘর থেকে ফুটফুটে আপার বিকৃত লাশ উদ্ধার করা হলো। আমাদের সবাইকে কবরের নির্জনতায় ঢেকে সে আশ্রয় নিল স্বর্গ কাননে।

এটাই ছিল আমার জীবনের শেষ নৌকা ভ্রমণ এবং নাজমাআপার শেষ খেয়া পার। সেই বিভীষিকাময় স্মৃতি আজও আমাকে তাড়া করে। আজও শুনতে পাই, নাজমাআপা আমাকে বলছে, চল শাপলা তুলতে যাই।

সোনাগাজী, ফেনী থেকে

পাইরেটস

– মনিকা পারভীন

ছোটবেলায় জলদস্যুর কথা পড়েছি গল্পের বই-এ। জলদস্যু ভাবলেই মনের মাঝে ভেসে উঠতো এক চোখ কালো চামড়া দিয়ে ঢাকা, এক চোখ খোলা, হাতে একটা খোলা তালোয়ার, ছোট ছোট চুল।

মনে আছে আব্বার সঙ্গে একবার গ্রামের বাড়িতে গেছি। ছোট চাচার জন্য মেয়ে দেখতে যাবেন আরেক গ্রামে। বড়রা সবাই যাবেন।

আমিও বায়না ধরলাম, যাবো।

কেউ রাজি নয়।

কিন্তু আব্বার কলিজা ছিলাম আমি। তাই আমাকে সঙ্গে নিলেন। তখন আমার বয়স হবে ছয় সাত বছর।

মেয়ে দেখে যখন ফিরছি দেখি আব্বা আমাকে ছৈয়ের ভেতর ঘুম পাড়িয়ে বাইরে বসে আছেন। আব্বাকে ছাড়া ঘুমানো সম্ভব নয়। তাই তার কোলে গিয়ে বসলাম। আব্বাকে দেখি চার দিকে কি যেন খুজছেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, কি খুজছেন?

এখানে নাকি অনেক ডাকাতি হয় রাতে। তাই জেগে আছি।

আমি একটুও ভয় পাইনি। আব্বা আছে, ভয় কিসের!

দুই.

তারপর আমার বয়স যখন পচিশ ছাব্বিশ বছর। তখন আমার সাবেক স্বামীর সঙ্গে জাহাজে এমভি মিতাতে। আমরা তখন সিংগাপুর পানির ওপর দিয়ে মালয়শিয়া যাচ্ছি। ওই জায়গাটাতে সি ট্রাফিক খুব বেশি বলে জাহাজ খুব আস্তে চলছে। লাইট সবগুলো জ্বালিয়ে বসার ঘরে বসে সেলাই করছি। আমার মেয়ে শামা খেলছে। চিফ অফিসার এবং আমার মেয়ের বাবা গল্প করছে।

রাত তখন দশটা। হঠাৎ দরজায় টোকা। আমাদের একোমোডেশনটা ছিল এমন যে, প্রথমে ছোট একটা প্যাসেজ, এক পাশে বেডরুম, অন্য পাশে বাথরুম এবং সোজা তার অফিস ও বাসার ঘর।

শামাকে বললাম, দেখতো কে?

ছোট মেয়ে বললো, আংকলরা।

রাত ছাড়া আমরা কখনোই দরজা লক করতাম না। আমরা তিনজন ম্যান হাইট উচ্চতায় বসার ঘরের দরজায় তাকিয়ে আছি কে এলো দেখতে। দেখি বিড়ালের মতো হামাগুড়ি দিয়ে একটা লোক উকি দিল। উকি দিয়েই সেকেন্ডের মধ্যে এক সঙ্গে সাত আটজন ইয়াং ছেলে তেইশ চব্বিশ বছরের, প্রত্যেকে শর্টস পরা, হাতকাটা গেঞ্জি, মাথায় পট্টি বাধা হাতে দেড় হাত লম্বা খোলা তালোয়ার অবশ্য চোখে কালো এক চোখ ঢাকা চামড়ার ঠুলি ছিল না। নিমেষের মধ্যে একজন আমাদের দুটো ফোন লাইন কেটে দিল। আরেকজন আমার মেয়ের মাথায় হাত রেখে তালোয়ার উচু করে ধরা। তিনজন এসে আমার মেয়ের বাবা আর চিফ অফিসারের হাত পেছন দিকে নিয়ে দড়ি দিয়ে বেধে ফেলে গলায় তলোয়ার ধরে। একজন আমার পাশে এসে দাড়ালো।

আমার হাতের পাশেই ছিল ছোট্ট স্টেরিও সেট। আরেকজন সেলাইয়ের ঝাপি থেকে একটা ফিতা তুলে গলায় ঝুলিয়ে নিল। ইশারা করে জানালো চুপ করে থাকতে। জানতে চাইলো, হোয়ার ইজ ডলার?

আমরা সবাই চুপ।

একজন আমার গায়ের গহনার দিকে হাত বাড়ায়।

সঙ্গে সঙ্গে যা গহনা আমার গায়ে ছিল সব খুলে দিলাম।

আমার মেয়ে কান্না শুরু করাতে আমার কোলে তাকে দিয়ে চুপ করাতে বললো।

আমি তো সমানে আমার মেয়ের বাবাকে বাংলায় বলে যাচ্ছি, দিয়ে দাও ডলারগুলো।

সে বললো, চুপ করে থাকো।

তারা বৃফকেস খুলে দেখলো কিছুই নেই।

পাশের শোবার ঘর থেকে আলমারি খোলার আওয়াজ পেলাম। বুঝতে পারছি ওই ঘর সব লণ্ডভণ্ড চলছে ডলারের খোজে।

একটু পরে চলে গেল ডোন্ট মুভ বলে। পুরো ব্যাপারটা তিন চার মিনিটের।

আমার সব স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছিল। জলদস্যুর বই পড়া, আব্বার মুখ থেকে শোনা। বিশ্বাস হচ্ছে না, এটা কি হলো! কয়েক মিনিট আমরা কেউ নড়লাম না।

তারপর আমাকে বলা হলো উঠে দরজা লক করে তাদের হাতের বাধন কেটে দিতে।

আমার পা ওঠাতে পারছিলাম না। হাত পা কাপছে। কোনো মতে উঠে দরজা বন্ধ করে তাদের হাতের দড়ি কাচি দিয়ে কেটে দিলাম।

তারা টেলিফোনের কানেকশন দিয়ে ইঞ্জিনরুমে বলে দিল ফায়ার এলার্ম বাজাতে।

সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার এলার্মে কেপে উঠলো চলন্ত জাহাজ।

আমরা সবাই শুয়ে পড়েছি। ডিউটি অফিসাররা ছাড়া সমস্ত জাহাজে দৌড়াদৌড়ি শুরু হলো। খোজাখুজি, কাউকে পাওয়া গেল না। জানতে পারলাম এরা খুব শক্তিশালী। স্পিডবোটে এসে চলন্ত জাহাজে ওঠে শুধু একটা দড়ির সাহায্যে। আবার এই দড়ি দিয়েই নেমে চলে যায়।

তিন.

সেবার ছিলাম *হিজবুল বাহার* জাহাজে। হজযাত্রীদের নিয়ে রওনা হয়েছি পবিত্র কাবা শরিফের উদ্দেশ্য। এসব প্যাসেঞ্জার ক্যারি করা শিপগুলো ছোট একটা শহর হয়ে থাকে। হাসপাতাল, ডাক্তার, নার্স, সুইমিং পুল, রেস্টুরেন্ট সব থাকে।

হঠাৎ একদিন ক্যাপটেন এসে আমাকে বলেন, একটু অভিনয় করতে হবে এক মৃত্যু পথযাত্রী রোগীর জন্য ডাক্তার সেজে।

সে বছর শিপে আমি ছাড়া অন্য কোনো অফিসারের স্ত্রী ছিল না। ডাক্তার ছিল পুরুষ। ক্যাপটেনের বিশ্বাস, আমার মতো মমতাময়ী চেহারা আর কথা দিয়ে হজ পর্যন্ত তার সঙ্গে ডাক্তার সেজে অভিনয় করলে এই হজযাত্রী অনেক শক্তি ফিরে পাবেন। তিনি এক ক্যানসারের রোগী। তার শেষ ইচ্ছা হজ করা। বয়স সত্তর।

তার সঙ্গে দিনের পর দিন ডাক্তার অভিনয় করে গেলাম। তার অবস্থা এতো খারাপ হচ্ছিল যে, আমাদের ভয় হচ্ছিল কতোদূর তিনি হজ করতে পারবেন।

এভাবে চললো বেশ কিছু দিন ডাক্তারের অভিনয় করে।

আমি গেলেই আমার হাত দুটো ধরে বলতেন, মা, আমি হজ করতে পারবো তো? আমারও সংশয় ছিল দিনে দিনে তার শরীর এতো খারাপ হচ্ছিল!

একদিন সকালে খবর এলো তিনি আর নেই। সবশেষ। আমি তাকে দেখতে যেতে পারিনি। শক্তিটুকু খুজে পাইনি। বার বার প্রাণের আকুতি কানে বাজছিল, মা, আমি হজ করতে পারবো তো?

বার বার বলেছি, বাবা, অবশ্যই হবে। নিয়ত করে ঘর থেকে বের হয়েছেন। হজ আপনার হয়েই গেছে বাবা।

তিনি জানতেন না যে তার ক্যানসার হয়েছে। চলে গেলেন চিরতরে। জানাজা হলো ডেকে।

ক্যাপটেন আমাকে জানালেন, রাতে *ওয়াটার বেরিয়াল* হবে যাকে আমরা বলে থাকি *সলিল সমাধি।*

এও এক অদ্ভুত নতুন বেদনাবিধুর অভিজ্ঞতা। সংসারের সবাই পড়ে রইলো। পেছনে শেষ দেখাটাও কেউ দেখতে পেল না।

একটা কফিনে ওনাকে রাখা হলো যার দুদিকেই দুই পাল্লা বিশিষ্ট দরজা। কফিনের দরজা দুই পাশ থেকে হুক দিয়ে আটকানো। হুকের সঙ্গে শক্ত শিপের এক ধরনের তার দিয়ে আটকিয়ে দিয়ে ক্রেনের সঙ্গে আটকানো হয়। কফিনটাকে বাংলাদেশের পতাকা দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়। সব অফিসার সারি বেধে দাড়িয়ে স্যালিউট দিয়ে শ্রদ্ধা জানালেন।

চার দিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। আমি উপরের ডেকে শিপের একেবারে পেছনে দাড়িয়ে একা সব দেখছি। আস্তে আস্তে মাঝ সমুদ্রে শিপটি থেমে গেল। ফ্লাডলাইট সমুদ্রে ফেলা হলো। ক্রেন দিয়ে কফিনটি আস্তে পানিতে নামানো হলো। পানির উপরে কফিনটি রেখে দুই পাশ থেকে দরজায় আটকানো হুক দুটো টেনে খুলে ফেলা হলো। সঙ্গে সঙ্গে ঘট করে দরজা দিয়ে লাশটি অতল জলে তলিয়ে গেল। এতো তীব্র আলো ছিল যে সাগরের ওই নীল পানিতে শাদা কাপড়ে বাধা লাশটি কিভাবে পানিতে তলিয়ে গেল তা স্পস্ট দেখা গেল।

শিপটি আবার তার আপন গতিতে চলা শুরু করলো।

তখনো আমার কানে বাজছে, মা, আমি ভালো হয়ে উঠবো তো? মা, আমাকে ভালো করে দিন। আপনি ডাক্তার, আপনি সব পারেন।

লাশটি যখন পানিতে তলিয়ে গেল তখন মনে মনে বলেছিলাম, আমার অভিনয়ের জন্য মাফ করে দিও বাবা। এছাড়া পথ ছিল না আমাদের।

আমরা জানতাম তিনি বেশি দিন নেই। যতোদিন বেচে ছিলেন ততোদিন মনে হয়, মনের জোরেই বেচেছিলেন। এই মনের জোর দেয়ার জন্য আমাকে ডাক্তার না হয়েও ডাক্তারের অভিনয় করতে হয়েছে। আমার দুই চোখে নোনা পানির বর্ষা ছিল সে রাতে।

ধানমন্ডি, ঢাকা থেকে

হস্তসুখ

– অজ্ঞাত

এক আত্মীয়ের বাসায় বেড়াতে যাবার সুবাদে জীবনে প্রথমবারের মতো লঞ্চযাত্রা করলাম। দিনটি ছিল মেঘলা। তারপরও ঝড়–বৃষ্টির প্রকোপ ছিল। বাসায় বাধা সত্ত্বেও যাত্রা শুরু করলাম।

সদরঘাট পৌছালাম বিকাল চারটায়। যাবো পটুয়াখালীর মির্জাগঞ্জ। উঠলাম আমতলী, ভায়া মির্জাগঞ্জগামী লঞ্চ এমভি মানসী ৩–এ। লঞ্চ উঠে ক্যাবিন পেলাম না। বাধ্য হয়ে ডেকে যাবো ভাবছি। কিন্তু দেখি ডেকে জায়গা খালি নেই। অতঃপর দুই নাম্বারি করে লঞ্চের কর্মচারীদের কাছ থেকে বিশ টাকা দিয়ে সিট (ডেকে ঘুমানোর জন্য তোশক) ভাড়া করলাম। লঞ্চ কর্মচারীরা এ ব্যবসা ভালো বোঝে।

ঝড়–বৃষ্টির রাত। নদীতে প্রচুর ঢেউ। ডেকে বসে কয়েকজন মিলে কার্ড খেলে সময় কাটালাম। আমার সঙ্গে ছিল ভাগ্নে নাসির।

রাত দশটার সময় লঞ্চের আনসার এসে খেলা বন্ধ করতে বললো।

অতঃপর খেলা বন্ধ করে চাদরের নিচে ঢুকলাম। কিন্তু ঘুমাতে পারলাম না। এ অবস্থায় কি ঘুম আসে!

হঠাৎ পাশে হাত পড়তে দেখি, নরম কিছুর ওপর হাত পড়লো। যৌবন মনে বুঝে নিলাম কিসের ওপর হাত পড়লো। হাত ছাড়িয়ে নিলাম। বিপরীত দিক থেকে হাত আক্রমণের আশংকা করছি। কিন্তু কোনো সাড়া নেই।

এবার কামনাময় মন নিশ্চুপ থাকতে পারলো না। চারদিকে সবাই ঘুমন্ত। শুধু লঞ্চের ইঞ্জিনের আওয়াজ। ঢেউয়ের তালে তালে ছুটে চলছে লঞ্চ।

আবার একটু চেপে হাত রাখলাম সেই অজানা তরুণীটির বুকে। আস্তে আস্তে চাপ দিলাম। বুক দুরু দুরু কাপছে। হাত চলছিল, বুকও চলছিল। কিন্তু সঙ্গিনীর কোনো খবর নেই।

এবার চাদরের নিচ দিয়ে হাত রাখলাম তার পাজামার ফিতায়। সাহস বেড়ে গেছে। আস্তে আস্তে হাত রাখলাম আরো নিচে। ভেজা জায়গায় হাতাতে থাকলাম।

হঠাৎ মেয়েটি একটু উল্টে এসে সরাসরি আমার বুকের ওপর পড়লো। আমি হাত সরানোর চেষ্টা করতেই বললো , কি, কেমন মজা লাগে?

আমি নিশ্চুপ। জানি না কি বিপদে পড়লাম।

আমার নিশ্চুপ থাকা দেখে মেয়েটি বললো, ডরান ক্যান? চাপ দেন। বলে তার হাত রাখলো আমার নিম্নাঙ্গে।

আমি আর থাকতে পারলাম না। জড়িয়ে ধরলাম তাকে। কিন্তু এতো লোকের ভিড়ে আসল কাজটি করা হয়নি। তাছাড়া একটু পর পর আনসার এসে চক্কর দিয়ে যায়। তাই কেবল হাতের সুখ মেটালাম।

ভোরবেলা পায়রা নদীতে এসে লঞ্চ যখন থামলো তখন ঘুম ভেঙে গেল। সারা রাত যাকে চাদরের তলায় চুমু দিলাম তার মুখশ্রী কেমন তা দেখতে ইচ্ছা করছিল। সঙ্গিনীর চাদর সরাতেই বের হয়ে এলো একটি কিশোরী মুখ। মুখ হা করে হাসতেই বের হয়ে এলো অনেক দিন দাত না মাজা হলদে দাতের পাটি।

তাই দেখে অনেক কষ্টে বমি চাপলাম। কোনো মতে কাপড়, চাদর প্যাক করে ভাগ্নেকে নিয়ে লঞ্চের ছাদে চলে এলাম।

একটু পরে সেই মেয়ে এসে হাজির। বললো, দূরে সইরা থাকেন ক্যান?

পড়ছি বিপদে। এ আপদ কাটলে আপাতত বাচি। রাতে কি করেছি না করেছি। এখন তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। অনেক বুদ্ধি করে ভাগ্নেকে বললাম, তুই তারে সামলা। সঙ্গে রাতের ঘটনা খুলে বললাম।

করিৎকর্মা ভাগ্নে দেখি মেয়েকে নিয়ে ক্যাবিনের চিপায় গেল।

একটু পর উকি দিয়ে দেখি ভাগ্নেও আমার মতো হাতে সুখ মেটাচ্ছে।

আমি পাহারায় আছি। মনে মনে বললাম, *মামাভাগ্নে যেখানে বিপদ নেই সেখানে।*

সামনে আমার গন্তব্য দেখা যাচ্ছিল। পরে সেই মেয়েকে দুই তলা ক্যাবিনের বাথরুমে আটকে রেখে আমরা লঞ্চ থেকে নেমে গেলাম।

সারা পথ রিকশায় বসে গত রাত ও সকালের কথা বলে মামাভাগ্নে হাসতে লাগলাম।

ঢাকা থেকে

অভিনব

– মুহাম্মদ উল্লাহ মুন্না

বহুদিন আগের কথা। তখন গ্রামে একটি লোক বিদেশ গেলে অথবা এলে সমগ্র গ্রাম জানাজানি হয়ে যেতো। এমনকি আশপাশের দুই তিন গ্রাম পর্যন্ত এ খবর ছড়িয়ে পড়তো। এটা তখনকার প্রথা অনুযায়ী সম্মানের কারণও ছিল। মূল ঘটনাটি বিদেশ থেকে আগত আমার পরিচিত রবিভাইকে ঘিরে। তাই বিদেশের কথা আসছে।

রবিভাই দশ বছর পরে দেশে আসছেন। তাই তাকে নিয়ে তার পরিবার এবং এলাকায় আগ্রহ ছিল প্রবল। কেননা তিনি এই দীর্ঘ সময় বিদেশ থেকে, বাড়িতে অনেক জমিজমা কিনে ঘরবাড়ি সাজিয়ে সুনাম অর্জন করেছেন। প্রতিক্ষার প্রহর শেষে আসার আগের দিন জানিয়ে দিলেন যে, আগামীকাল আসছেন। তাকে আনার জন্য ছোট ভাই এবং দুলাভাই এয়ারপোর্ট এলেন। তারপর তাকে নিয়ে বাড়ির পথে যাত্রা শুরু করলেন।

উল্লেখ্য যে, রবিভাইয়ের বাড়ি পৌছাতে পাচ ঘণ্টা নৌপথ পাড়ি দেয়ার প্রয়োজন হয়। তাই সড়ক পথ শেষে যখন নৌঘাটে পৌছালো তখন নৌঘাটে ট্রলার ছিল মাত্র একটি। বিদেশি বলে ভাড়া হাকালো দামের চেয়ে অনেক বেশি। শেষে কিছুটা কমিয়ে রাজি হলো। কিন্তু যখন ট্রলার ছাড়বে তখনই বাধলো বিপত্তি।

কোথেকে দুই তিন লোক এসে হাউ মাউ করে কেদে ফেললো যে আমাদের বাড়ি আপনাদের পাশের গ্রামে। আমার ভাই সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছে, এখন টাকার অভাবে তার লাশ বাড়িতে নিতে পারছি না।

রবিভাই তাদের কথা শ্রবণ করে দ্বিমত পোষণ করেননি। তাদেরকে বললেন, দ্রুত লাশ নিয়ে ট্রলারে উঠে যেতে।

তারা বাক্সে ঢোকানো লাশ নিয়ে এলো এবং ট্রলারও ছেড়ে দিল।

ট্রলারে বসে তাদের কাছ থেকে মৃত্যুর ঘটনা রবিভাই পুঙ্খানপুঙ্খ শুনে তাদেরকে সান্ত্বনা দিলেন।

তারপর এক পাশ হয়ে ছোট ভাই ও দুলাভাইয়ের সঙ্গে পরিবারের খবর এবং নিজের বিদেশের গল্প করছেন। মাঝি উপরে থেকে ট্রলার পরিচালনা করছে এবং মাঝির ছোট ছেলেটি রবিভাইয়ের খোশ গল্প শুনছে। চতুর্দিকে নজর রাখছে। হঠাৎ করে সে দেখতে পেল, লাশের মাথার দিকে একজন কান লাগিয়ে কি যেন শুনছে। সে কিছুটা কাছে গিয়ে না দেখার ভান করে সে লাশ এবং ওই লোকের মাঝে হওয়া কথাটুকু শুনে ফেলেছে। সঙ্গে সঙ্গে উপরে গিয়ে বাবাকে জানিয়ে দিল।

মাঝির বুঝতে বাকি থাকলো না এরা ডাকাত দল। মাঝি আবারও ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলো যে লাশ এবং লোকটা কি বলছে।

তখন সে বললো, লাশ বলছে, আর কতো দেরি, এখনো সময় হয়নি?

তখন লোকটা বললো, এই তো সামনের ঘাটটা পার হলেই হলো, বেশি দেরি নেই।

এদিকে রবিভাই তার গল্পে লিপ্ত।

মাঝি কৌশলে তেল নেই বলে সামনের ঘাটে ট্রলার থামিয়ে কন্টেইনার নিয়ে বাজারে গিয়ে ডাকাতদের কথা মোটামুটি কিছু লোককে জানিয়ে দ্রুত ফিরে এলো।

সে তেল ঢালার অভিনয় করতেই লোকজন ট্রলারে উঠে লাশের বাক্সের ঢাকনা ফেলে লাশকে টান দিয়ে উঠালে দেখি এক জীবন্ত মানুষ, কাফনের কাপড় পরা নেই। লুঙ্গি এবং শার্ট পরা।

ততোক্ষণে লোকজনের গণপিটুনি শুরু হয়ে গেছে লাশসহ তার সহযোগীদের।

রবিভাই তো এই অবস্থা দেখে হতবাক।

পরে খবর পেয়ে পুলিশ এসে এই তিন ডাকাতকে বুঝে নেয়। কিন্তু ততোক্ষণে ডাকাতরা পঙ্গু প্রায়। তারপর রবিভাই বাজারের সকলের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং মাঝি ও তার ছেলেকে পুরস্কৃত করেন।

ভাদুঘর, ভূইয়াবাড়ি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে

বিকৃত

জুলাই ১৯৮০ সালে ঢাকায় হেড অফিসের কাজ শেষে *গাজী স্টিমার*–এ বরিশালে ফিরে চলেছি। ইলিশ মাছ আর ডাল দিয়ে যতোটা পারি ফ্রি ভাত পেট পুরে খেয়ে রেলিং ধরে দাড়িয়ে। হঠাৎ চোখ আটকে গেল এক তরুণীর ওপর। বয়স খুব বেশি হলে পনেরো কিংবা ষোল হবে। তার চেহারা, গায়ের রঙ এবং চুলের সৌন্দর্যে এমন কিছু ছিল যে শত চেষ্টাও চোখকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে ব্যর্থ হচ্ছি।

দীর্ঘ সময়ের নৌ যাত্রাপথে এমন ধরনের ছোট রোমান্টিক ঘটনা অনেক সময় বেশ আনন্দময় হয়ে ওঠে। এ ধরনের কাব্যিক কল্পনা অদৃশ্য সুতার টানে ডেকের উপর তাকে কেন্দ্র করে এদিক–ওদিক ঘুরছি। তার চোখ আর মাঝে মধ্যে নীরব মিষ্টি হাসি আমাকে নদীর জোয়ার–ভাটার মতোই উত্তাল করে তুলছে।

সন্ধ্যার দিকে তার হাতে দীর্ঘক্ষণ থেকে ধরে রাখা পত্রিকাটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য নাড়াচ্ছে। কিছু পরে ডেকের চায়ের স্টল থেকে সে উঠে গেল। কিন্তু পত্রিকাটি বসার টুলে রেখে গেল।

দ্রুত হাতে নিয়ে শেষের পাতায় নিচের দিকে শুধু ঢাকার মালিবাগের একটি কলেজের নাম দেখলাম।

প্রায় পনেরো দিন পরে ভোর থেকে একটি বৃজের পাইল ড্রাইভ তদারকি করছি। সকাল দশটার দিকে ফেরার জন্য রওনা দিলাম। তিন কিলোমিটার মতো এগোতেই দেখি মিনিট দশেক আগে চলে যাওয়া বাসটি আকাশের দিকে পা তুলে পাশের খাদে। আশপাশের লোকজন আহত ও নিহতদের প্রায় টেনে বের করে ফেলেছে।

চমকে দেখি ঢাকা থেকে আসার সময়ে সেই মেয়েটির সঙ্গে থাকা বড় ভাইয়ের মাথা থেকে রক্ত ঝরছে। দ্রুত এগোতেই দেখি সে মাটির ওপর অচেতনভাবে শুয়ে আছে। একটি হাত প্রায় গুড়িয়ে গেছে। রক্তে অর্ধেকটা শরীর তার ভেজা। কোনো দিক না তাকিয়ে তার আহত বড় ভাইয়ের হাত চেপে ধরলাম। তাকে তার বড় ভাই ও আমি খুব সাবধানে ধরে এগিয়ে আসা ট্রাকে উঠালাম।

দ্রুত মোটর সাইকেল নিয়ে বরিশাল শহরের ঠিকানায় তার ফুপার বাসায় ঘটনা জানালাম। হসপিটালে ফিরে দেখি মেয়েটি হাতের প্রচণ্ড ব্যথায় চিৎকার করছে। ঘণ্টা খানেক পরে অপারেশন। ব্যথা কমার ইনজেকশন দেয়ায় সে কিছুটা শান্ত হলো। চোখে অবাক ভাব নিয়ে কয়েকবার দৃষ্টি বিনিময় করেছে।

একটার দিকে বাসায় এসে জামায় রক্ত লেগে থাকায় গোসল করে মেডিকাল কলেজে যাওয়ার পথে প্রজেক্ট অফিসে আসতেই মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার লঞ্চে কয়েকটি জরুরি ফাইল নিয়ে

ঢাকা যেতে হবে। আড়াইটায় মেডিকালে ফিরে দেখি বারান্দায় কয়েকজন মহিলা কাদছে। ট্রলিতে আপাত মস্তক ঢাকা একটা মানব দেহ। আমি চলে যাওয়ার আধঘণ্টা পরে সে মারা যায়।

কেন যেন মনে হলো হয়তো তার ষোল বা সতেরো বছরের এ জীবনে সে জন্মে শিশু হয়েছিল, একটু বড় হয়ে খুকি এরপর কিশোরী হয়ে পূর্ণ নারী হওয়ার আগে তার জীবন প্রদীপ নিভে গেল। হলো না সে বধূ, মা, নানি বা দাদি। জীবন নাটকের শেষটায় এক লাফে মাঝের অংশগুলো বাদ দিয়ে পৌছে গেল। লাশ বা মুর্দা যার কোনো ভাষাগত লিঙ্গ নেই। মৃত মানুষ। দাফনের পর সে হয়ে যাবে কবরবাসী।

যে কিশোরী বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরের আব্রু তার জন্মদানকারী মায়ের কাছেও প্রকাশ করেনি, সে কিশোরীর দেহকে লাশকাটা ঘরে নিয়ে তার শরীর উন্মুক্ত করে ডোম পেশার এক পুরুষ তার দেহ ধারালো চাকু আর ভারী হাতুড়ি দিয়ে বাড়ি দিয়ে কেটে তছনছ করবে এ কথায় কেন যেন আমাকে যন্ত্রণায় পাগল করে তুললো। প্রায় তীব্র ভয় আর আতংক নিয়ে বাসায় চলে এলাম।

শেষ খবরটা না নিয়ে ঢাকা নৌ যাত্রা করায় নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে। লঞ্চে উঠে সিঙ্গল ক্যাবিনে অফিসের অতি জরুরি হিসাবপত্র করতে রাত এগারোটা হয়ে গেল। ক্যাবিন থেকে বেরিয়ে লঞ্চের শেষের দিকে নজর পড়তেই চমকে উঠলাম। মেয়েটির ফুপা।

ভদ্রলোক বললেন, ট্রাকে লাশ নিয়ে তার সঙ্গে মহিলাসহ যেতে অসুবিধা হবে বলে শেষে লঞ্চযাত্রী হয়েছেন।

রাত প্রায় তিনটা। তার জীবনের শেষ নৌ যাত্রায় তাকে দেখতে লঞ্চের মাঝের সিড়ি দিয়ে পেছনে দক্ষিণ পাশের দিক এগোলাম। আর একটু এগোতেই দেখি সে কফিনে। মনে পড়লো মাত্র পনেরো দিন আগের গাজী স্টিমারে সদরঘাট থেকে বরিশাল নৌ যাত্রার কথা। তার অপূর্ব মানবী চেহারা, দূর থেকে দেখা শব্দহীন বিজলির মতো হাসি আর কৌতুক মাখা চাহনি আজ সবই ওই কাঠের বাক্সে বন্দী। প্রায় আধঘণ্টা তার কফিনের দিকে একটানা তাকিয়ে চোখের পানি এবং বুকের ভেতর থেকে উঠে আসা কান্নার দমক চাপার কষ্টের মধ্যে লঞ্চের দুজন আনসার এগিয়ে আসে।

আমাকে এভাবে একা দাড়িয়ে থাকতে দেখে বলে, উপরে যান, এখানে একা দাড়িয়ে নিরাপদ নয়।

হায় নিরাপত্তা! এ শব্দটা এখন এ রাতে তার কফিনের সামনে খুব জটিল হয়ে উঠলো আমার জন্য।

এই হৃদয়বিদারক ঘটনার পরে বরিশাল আর নৌ যাত্রা আমার কাছে এক অসহনীয় পর্যায়ে পৌছালো। এখনও মধ্য জীবনের মনের পর্দায় এ ঘটনা জীবন্ত হয়ে ভেসে ওঠে।

নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

সেদিন বিকেলে

– খালেদা পারভীন মুন্না

সময়টা হবে ১৯৮৭ থেকে ১৯৮৮ সালের দিকের। আব্বার চাকরি সূত্রে আমরা তখন নোয়াখালী *ডেল্টা জুট মিলস*–এর অফিসার্স কোয়ার্টারে থাকতাম। এ জুট মিলস–এর ভেতরের প্রাকৃতিক দৃশ্য খুবই মনোরম ছিল। বিশাল বড় খেলার মাঠ, পার্কসহ চিত্ত বিনোদনের অনেক উপকরণ ছিল। তবে সবচেয়ে মনোমুগ্ধকর ছিল একটা বড় দীঘি। এর ঠিক মাঝখানে ছিল একটা কাচঘর। কাচঘর বলছি এই কারণে যে, ঘরটা ইটের তৈরি হলেও এর চারপাশে বড় বড় রঙিন কাচের জানালা ছিল। সেই রঙিন কাচে ঘেরা ঘরটাকে দেখতে স্বপ্নপুরী বলে মনে হতো।

আমরা সব বান্ধবীরা প্রতিদিন বিকেলে সেই দীঘিতে নৌকায় চড়ে ঘুরে বেড়াতাম। আমরা পালা করে এক একদিন একজন নৌকা চালাতাম। প্রতিদিন আমাদের লক্ষ্য হতো দীঘির মাঝখানে ওই ঘরটাতে পৌছানো।

একদিন এ রকম আমরা কাচঘরে পৌছে ভেতরে মজা করছিলাম। মনের ভুলে সেদিন নৌকাটা বেধে রাখিনি। হঠাৎ খেয়াল হলে এসে দেখি বাতাসে দুলতে দুলতে নৌকা অনেক দূরে চলে গেছে। আমাদের তো চোখ চড়কগাছ। এখন উপায়! আমরা পাড়ে পৌছাবো কিভাবে। আমরা কেউ সাতারও জানি না। জানে শুধু রেখা।

তাকে বলতে লাগলাম, তুই সাতার জানিস, তুই গিয়ে নৌকটা নিয়ে আয়।

রেখা যাবেই না। তার নাকি খুব লজ্জা লাগে।

অবশ্য লজ্জা লাগারই কথা। ততোক্ষণে দীঘির পাড়ে দাড়িয়ে ছেলেরা আমাদের দুর্ভাগ্য দেখে খুশিতে এক একজন ডিগবাজি খাচ্ছে।

ছেলেদের সঙ্গে ছিল আমাদের আজীবন শত্রুতা। তাই আমরা তাদের কোনো সাহায্য নেবো না। কিন্তু তারা চাইছে আমরা যেন মুখ ফুটে তাদেরকে বলি আমাদেরকে সাহায্য করতে।

এদিকে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা প্রায় ঘনিয়ে এলো। চিন্তায় আমাদের পাগল হবার অবস্থা। অবশেষে হার মানতে হলো। ছেলেদেরকে হাতজোড় করে মাফ চাইবার ভঙ্গি করলাম সবাই লাইন বেধে।

ততোক্ষণে ছেলেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে কার আগে কে আমাদেরকে হেলপ করতে আসবে। পারলে তো একজনের ওপর আরেকজন দীঘিতে ঝাপ দেয়। হিরো হবার এই চান্স কেইবা হারাতে চায়?

অবশেষে তিনজন হিরো মিলে নৌকা নিয়ে সাতরে আমাদেরকে উদ্ধার করলো রীতিমতো সিনেমাটিকভাবে।

এরপর আর কি! ছেলেদের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব হয়ে গেল। বিপদের বন্ধু বলে কথা! অবশ্য দুই একজনের প্রেম হতেও বাকি থাকেনি।

মাইজদীকোর্ট, নোয়াখালী থেকে